ওঁতৎসৎ

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

ত্রয়োবিংশ কল্প—প্রথম ভাগ

সংখ্যা ১০৬১ | ১৮৫৩ শক পৌষ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩২। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২

মাতৃমঙ্গল।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০১। লওয়া আর দেওয়া।

মা! আজ যে তুমি আর সকলকে ছাড়িয়া আমার কাছে আসিয়া বসিয়াছ, আমার প্রাণে যে কি ভাব উথলিয়া উঠিতেছে, তাহা তোমাকে জানাইয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। জোয়ার আসিলে যেমন নদীবক্ষ স্ফীত হইয়া কাহাকেও ধরিবার জন্য ছুটিয়া যায়, আমার প্রাণও তেমনি আজ তোমার ভালবাসা পাইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিতেছে। যে গান গাহিয়া তুমি আমায় কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইতে, আজ সেই গান আমার প্রাণের দুই কূল ছাপাইয়া উথলিয়া উঠিতেছে। তুমি কাছে আছ, আমার ভয় ভাবনাও সমস্তই দূরে চলিয়া গিয়াছে। সুনীল গগনের প্রশান্ত দৃষ্টির মধ্যেও যেমন শান্তি লাভ করি, সেই আকাশ যখন প্রবল ঝড়ের বজ্রগর্জ্জনে খণ্ডবিখণ্ড হইবার উপক্রম করে, তাহারও মধ্যে সেই রকমই শান্তি লাভ করি। তোমায় নিকটে পাইলে আমার কাছে সরবও নীরব হইয়া যায়, আর নীরবও সরব ভাব ধারণ করে। ফুলেরা যখন তাহাদের কচিমুখে হাসিতে থাকে, তখন সত্যই সে হাসিতে তোমারই হাসি দেখিতে পাই, আর প্রাণের মধ্যে যে শান্তি লাভ করি, সে শান্তির তুলনা খুঁজিয়া পাই না। প্রভাতে পাখীদের কলগানে তোমার যে সুন্দর আহ্বান শুনিতে পাই, সত্যই সে স্বরের সঙ্গে অন্য কোন স্বরেরই তুলনা হয় না। আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার সংসারে থাকিবার প্রবৃত্তির পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এখন চাই, তুমি আমার দেহমন পরিশুদ্ধ করিয়া লও আর আমাকে তোমার কাছে ডাকিয়া লও। যে শান্তির আস্বাদ পাইবার অধিকার এখনই আমাকে দিতেছ, সেই শান্তির সুগভীর সাগরে আমি আপনাকে চিরতরে ডুবাইয়া রাখিতে চাই। জননী! আমি আজ সুখের অগ্নিতে দুঃখের অশ্রুর যজ্ঞ করিতে চাই, শান্তির অশ্রু আজ তোমার চরণে নিবেদন করিতে চাই। তুমিই আমার সকলই গ্রহণ করিয়া আমাকে তোমায় দাও। আমি যেমন তোমাকে আমায় দিতেছি, তুমিও তেমনি আমাকে তোমায় দিয়া আমার মনপ্রাণ ভরিয়া দাও। তোমার এই দীনদুঃখী সন্তানকে সহায়-সম্বলে পূর্ণ করিয়া দাও। আমার অশ্রু মুছিয়া যাক।

১০২। স্মৃতির আনন্দ।

মা! তোমার কোলে কবে সেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—সেইদিন তুমি কি রকম আদরের সঙ্গে আমাকে তোমার বুকের ভিতর জাপটাইয়া ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন দিয়াছিলে—তাহার অস্ফুট স্মৃতি আজও আমার প্রাণকে সময়ে সময়ে আকুল ব্যাকুল করিয়া তোলে। আর কি তুমি তেমন করিয়া আমায় কোলে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন দিবে না? তোমার আলিঙ্গনের স্মৃতি প্রাণের ভিতর যখনই জাগিয়া উঠে, তখনই আবার সেইরকম আলিঙ্গন পাইবার জন্য বুকের ভিতর ধকধকি বাজিতে থাকে। তোমার আলিঙ্গন না পাইলে সে ধকধকি কিসে নির্ব্বাপিত হইবে তাহা জানি না। সর্ব্বদাই ইচ্ছা হয়, তোমার কোলে আর একবার নূতন জন্ম গ্রহণ করিয়া সেই রকম আদর ও আলিঙ্গন আর একবার লাভ করি। তোমার ভালবাসার আস্বাদ একবার পাইয়াছি বলিয়া যেই তাহার এতটুকু অভাব কল্পনা করি, অমনি জ্বালায় ও যন্ত্রণায় কত না ছটফট করি; কিন্তু সেই জ্বালাযন্ত্রণাও যে কত মিষ্ট তাহা বলা যায় না। তাই সেই জ্বালাযন্ত্রণা অনুভব করিবার জন্যই দিকে দিকে ছুটিয়া বেড়াই। তখন মনে হয়, সেই দুঃখকষ্টের রাত্রি কবে প্রভাত হবে; অথচ প্রভাত যে শীঘ্র হয়, তাহাও প্রাণ যেন সত্য-সত্য চাহিতে সাহস করে না; কারণ যতক্ষণ দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়া যাইতে হয়, ততক্ষণই তো অন্তত স্মৃতিতে তুমি সর্ব্বদাই কাছেই থাক। ভয় হয়, দুঃখনিশা প্রভাত হইলে পাছে তুমি আমা হইতে দূরে সরিয়া যাও; পাছে তুমি আমাকে একটী স্নেহচুম্বন দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়া কোথাও চলিয়া যাও। জননী! তুমি দূরে যাইও না। তোমার কোলের কাছে আমাকে দুদণ্ড বসিতে দাও; আমি আবোলতাবোল ভাষায় কত কি বলিয়া চলিব, আর তুমি সেই অপূর্ব্ব ভাষায় মুগ্ধ হইয়া মাঝে মাঝে আমাকে একটুখানি আদর করিও এবং স্নেহচুম্বনে আমাকে ভরিয়া দিও।

১০৩। চিরমিলন।

মা! জন্ম যখন দিয়াছ, তখন আর বিদায়ের কথা বলিতে পারিবে না। তুমি জন্ম দিয়া তোমার সঙ্গে আমার, মাতার সঙ্গে সন্তানের যে যোগ-বন্ধনের অধিকার দিয়াছ, সে যোগের বিচ্ছেদের কথা আমি কিছুতেই শুনিতে পারি না। আমার সমস্ত প্রাণ একই গান অধিকার করিয়া আছে—তাহা মিলনের গান। জন্ম যখন দিয়াছিলে, তখন সূর্য্যচন্দ্র গ্রহতারা সকলেই আমাকে ঐ গানেরই মন্ত্র আমার কানে দিয়া গিয়াছিল। আজ যখন এলোকে আমার কাজ সারা হইতে চলিয়াছে, তখন দেখি, সকলেই একে একে আমাকে ছাড়িয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহাতে তো বিচ্ছেদের এতটুকু ভয়ও আসিতেছে না, আর তাহার জ্বালাযন্ত্রণাও এতটুকু আমার প্রাণে লাগিতেছে না। তুমি আমার সঙ্গে আছ, তাই সমস্ত মিলনের বাতাস আমাকে ঘিরিয়া আছে। রাত্রির যে অন্ধকার আমাকে ঘিরিতে চলিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া দিব্য আলোকের সমুজ্জ্বল-প্রভা উঁকিঝুঁকি মারিতেছে; আমি তাহা দেখিতেছি, আর আমার ভয়ভাবনা সকলই বিদূরিত হইতেছে। মৃত্যুর নামে অনেকেই আমাকে ভয় দেখাইতে চায়। তাহারা আমাকে বুঝাইতে চায় যে, মৃত্যুতেই নাকি তোমার সঙ্গে আমার চির-বিচ্ছেদ ঘটিবে। প্রথম প্রথম যখন তাহাদের কথাগুলি শুনিতাম, তখন মনে হইত, সেই সমস্ত কথার মধ্যে কত জ্ঞান কত প্রেম ছাইয়া আছে। কিন্তু তোমার সঙ্গে চিরমিলনের রহস্য যেদিন আমার প্রাণে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, সেইদিন অবধি তাহাদের ঐ সমস্ত কথা নিতান্তই শূন্যগর্ভ, নিতান্তই ফাঁকা কথা বলিয়া বুঝিয়াছি; সেইদিন অবধি আমার প্রাণের সমস্ত দ্বন্দ্ববিবাদ, সকল সংশয়সন্দেহ ঘুচিয়া গিয়াছে। সেইদিন অবধি আমি মিলনের সাগরে অবগাহন করিয়া আমার অন্তরের সমস্ত কলুষ ধুইয়া ফেলিয়াছি; সেইদিন অবধি মিলনের বাতাসে তুষ্টিপুষ্টি সকলই লাভ করিয়াছি; সেইদিন অবধি মিলনের সুগন্ধে আমার মনপ্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে—আমার বাক্য স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মন এখন বাহিরের কোনও কথায় সাড়া দিতে পারে না—একমাত্র অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে তোমার ডাকেরই উত্তরে সাড়া দিতে চায়। চারিদিক অন্ধকার হইয়া যাক,

চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া যাক, তুমিই আমাকে সেই প্রগাঢ় অন্ধকারের ভিতর, সেই সুগম্ভীর সাড়াহীন নিস্তব্ধতার ভিতর তোমার কোলে লইয়া নিরবধি তোমার অমৃতধারার স্তন্য পান করাও—আমি একটুখানি শান্তি লাভ করি, আমার সংসারের পাপতাপের সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা নির্ব্বাপিত হউক।

১০৪। অশ্রুনিবেদন।

মা! এত প্রলোভনের বিষয় আমার চারিদিকে ছড়াইয়া রাখিয়া আমাকে লোভ দেখাইবার উদ্দেশ্য কি, তাহা তো বুঝিতে পারি না। দিনে নিশীথে সুমধুর বাতাস, সূর্য্যের আলো, চাঁদের কিরণ, সমস্তই যেন আমাকে সেবা করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। সময়ে সময়ে তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতে করিতে, তাহাদের খেলা দেখিতে দেখিতে তোমাকে কখন কোন সূত্রে হঠাৎ একটু ভুলিয়া যাই; ক্ষণেক পরেই আবার যখন তোমায় মনে পড়ে, তখন চমকাইয়া উঠি। ভুলিয়া গিয়াছিলাম মনে করিয়াই আমার দুই গাল বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে থাকে। অশ্রুধারার এক এক ফোঁটা পড়ে আর একএকটা মুক্তাকণায় পরিণত হয়। তোমাকে ভুলিয়া যাওয়ার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে সেই মুক্তাকণাগুলিই কুড়াইয়া লইয়া তাহা দ্বারা তোমার চরণপূজা করিয়া আমার প্রাণে শান্তি আনয়ন করির। তোমার চরণপূজা না করা অবধি আমার প্রাণে শান্তি নাই, চক্ষে নিদ্রা নাই, ক্ষুধাতৃষ্ণা সকলই হারাইয়াছি। আমার চারিদিকে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে। তুমি যখন কাছে থাক, যখন তোমাকে সর্ব্বদাই নিকটে দেখিতে পাই, তখন সেই আনন্দের হাসিতে আমারও অন্তরে আনন্দের উৎস খুলিয়া যায়। কিন্তু সেই হাসিতে যখন ডুবিয়া যাই, তখন তুমি সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাও, আর আমার অন্তরে সেই আনন্দের উৎসও সহসা শুকাইয়া যায়, হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিতে থাকে—তখন চারিদিকে সতাই বিষাদের ঘন অন্ধকার আমাকে ঘিরিয়া ফেলে। সেই অন্ধকারও আমার ভাল, সেই হৃৎস্পন্দনও আমার ভাল। সেই স্পন্দনের উত্তরেই সাড়া পাই যে, তুমি আমার কাছে ছুটিয়া আসিতেছ; তোমার জ্যোতিতে সমস্ত অন্ধকার প্রভাতের মধুর আলোকে উদ্‌ভাসিত হইতে থাকে। মা! আর আমাকে প্রলোভনের বিষয়ে ঘিরিয়া রাখিও না—আমি শুধুই, আমি শুধুই তোমার কাছে থাকিতে চাই, তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে ফিরিতে চাই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও দীক্ষাব্রত।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিবস ৭ই পৌষ।

অদ্য শুভ ৭ই পৌষ। এই শুভ ৭ই পৌষে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অন্যান্য কুড়ি জন সঙ্গীগণের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহই জীবিত নাই—সকলেই পরলোকে। তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি যাঁহারা দীক্ষাগ্রহণে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও অনেকে পরলোকগমন করিয়াছেন। আর অল্পসংখ্যক লোকই বোধ হয় ইহলোকে জীবিত আছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে খুবই অল্পসংখ্যক ব্যতীত কেহ যে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত সম্পূর্ণরূপে পালনপূর্ব্বক উদ্‌যাপন করিয়াছেন, তাহা শুনিতে পাই না।

২। ৭ই পৌষ পবিত্র কেন?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই ব্রত সম্পূর্ণ উদ্‌যাপন করিয়া দীক্ষাদিবসকে পূর্ণ মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। মহর্ষি দেখাইলেন যে, দীক্ষার অর্থ কেবল কতকগুলি অর্থহীন মন্ত্র মুখস্থ আওড়ান নহে, কিন্তু দীক্ষামন্ত্রের অর্থ হৃদ্‌গত করিয়া তাহা সাধ্যমত জীবনে প্রতিপালন করিবার চেষ্টা—এক কথায় এইরূপ মন্ত্রের সাহায্যে নিজের জীবনকে সংগঠিত করা; ইহাতেই দীক্ষার গুরুত্ব, এবং এই গুরুত্বের কারণে দীক্ষাদিবসের পবিত্রতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় জীবনের দ্বারা ইহা প্রত্যক্ষ করাইলেন। এই কারণে ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই নিকট ৭ই পৌষ বড়ই পবিত্র বলিয়া গৃহীত হয়।

পবিত্র ১১ই মাঘে জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অসাম্প্রদায়িকভাবের ব্রহ্মোপাসনার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ঐ দিবস যেমন জগতের সর্ব্বত্র ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই নিকট অত্যন্ত প্রিয় ও উৎসবের কারণ হইয়া উঠিয়াছে,

* গত ৭ই পৌষ আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে পঠিত।

সেইরূপ পবিত্র ৭ই পৌষ দিবসে দীক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তনের দ্বারা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মোপাসকদিগের সংসারের সকল ক্ষেত্রে ও জীবনের সকল বিভাগে অপ্রতিম পরমেশ্বরের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করাইলেন ও তাঁহার বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন বলিয়া ঐ দিবসও জগদ্বাসী ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই নিকট একটি পুণ্যদিবসরূপে গৃহীত হইয়াছে ও হইতে থাকিবে।

৩। দীক্ষাব্রতের গুরুত্ব।

এই দীক্ষাব্রতের গুরুত্ব ও পবিত্রতা উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে। কেবল স্মৃতিদিবস-স্বরূপে বা উৎসবের দৃষ্টিতে এই দিবসকে দেখিলে চলিবে না; দীক্ষার গুরুত্ব ও পবিত্রতা দীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়া উহাতে আপনাকে ডুবাইয়া দিতে হইবে এবং ভগবানের সহিত আপনাকে একাত্মযোগে যুক্ত করিতে হইবে, তবেই এই ৭ই পৌষে উৎসব অনুষ্ঠানের সার্থকতা হইবে।

৪। দীক্ষাপ্রবর্ত্তন বিষয়ে মহর্ষির উক্তি।

এই দীক্ষা প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে মহর্ষি বলেন, "যখন সমাজে লোকের সমাগম বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন মনে হইল যে লোক বাছা আবশ্যক। কেহ বা যথার্থ উপাসনার জন্য আগমন করে, কেহ বা লক্ষ্যশূন্য হইয়া আইসে—কাহাকে আমরা ব্রহ্মোপাসক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? এই ভাবিয়া স্থির করিলাম, যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। যখন ব্রাহ্মসমাজ আছে তখন তাহার প্রত্যেক সভ্যের ব্রাহ্ম হওয়া চাই।......যখন প্রতিজ্ঞা দ্বারা ব্রাহ্ম হওয়া স্থির হইল, তখন এই মনে ছিল যে যাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্ম হইবেন, তাঁহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন, যত্নশীল হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই হইল যে, প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াও তাহা পালন করিতে অনেকে ঔদাস্য করিতেন ও গর্হণীয় হইতেন"।

৫। দীক্ষাকালীন প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রয়োজনীয়তা।

দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্ত্তিত সেই আদিম দীক্ষাপ্রণালীর অভিব্যক্তিতে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান দীক্ষাপ্রণালী সমুদ্ভূত হইয়াছে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বাপর প্রচলিত বিবাহ সম্বন্ধীয় পণপত্র প্রভৃতির আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া দীক্ষাকালেও একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করাকে উহার অঙ্গীভূত করা হইয়াছিল। এইরূপ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করা দীক্ষাগ্রহণের একটা বহিশ্চিহ্ন মাত্র স্বীকার করি। অন্তরে প্রতিজ্ঞাপালনের তীব্র ও গভীর আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে শত স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞাপত্র যে সাধারণতঃ ছিন্নপত্রস্বরূপে গৃহীত হইবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু অন্তরে প্রতিজ্ঞাপালনের যথার্থ আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ থাকিলে প্রকাশ্যে এইরূপ প্রতিজ্ঞাগ্রহণ ও প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করা প্রতিজ্ঞাগ্রহীতাকে ব্রতপালনে প্রভূত সহায়তা করে এবং বিপথে পদার্পণ হইতে সহজে রক্ষা করে, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে সুরাপাননিবারিণী সভার প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিবার ফলে অনেক ব্যক্তি সুরাপায়ী-দিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। প্রকাশ্য প্রতিজ্ঞাগ্রহণের বলবিধান সম্বন্ধে আমরা মহাত্মা গান্ধীর উক্তি হইতেও যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই।

৬। ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষাপ্রণালী সরল ও সহজ।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত দীক্ষাপ্রণালী অতি সরল ও সহজ। ইহার জন্য বাহ্যাড়ম্বরের কোন প্রকার ঘনঘটা আবশ্যক নাই, অথবা কুলগুরু প্রভৃতি ব্যক্তিবিশেষেরও অপেক্ষা নাই; প্রত্যেক মানবই ভগবানের সন্তান এবং তিনি প্রত্যেক মানবেরই পিতামাতা। প্রত্যেক সন্তান যেমন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলেই কোন বাধাবিঘ্ন না মানিয়া তাহার পিতামাতার নিকটে সহজে উপস্থিত হয়, সেইরূপ প্রত্যেক মানবসন্তানও আকাঙ্ক্ষা জাগিলে যাহাতে পরম পিতামাতা পরমেশ্বরের নিকট সরল ও সহজ পথ ধরিয়া উপস্থিত হইতে পারে তাহারই উপযুক্ত পথনির্দ্দেশক করিয়া এই দীক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

৭। ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষাপ্রণালীতে সাম্প্রদায়িকতার অভাব।

ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বেও সুবিস্তৃত সকল ধর্ম্মসমাজের মধ্যেই নিজ নিজ ধর্ম্মমতের অনুযায়ী দীক্ষা লইবার প্রথা যে প্রচলিত ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। কোন-না-কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণ বা ব্যবহার করা সেই সকল প্রণালীর অঙ্গীভূত ছিল দেখা যায়। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তিত দীক্ষাপ্রণালীর মধ্যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণের বা ব্যবহারের অবসর আসে নাই এবং আসিতে পারেও না।

৮। দীক্ষামন্ত্র গোপনীয় রাখার কুফল।

ব্রাহ্মসমাজের এই দীক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা গোপনীয়—ইহার মন্ত্রও গুপ্তমন্ত্র নহে এবং ইহার প্রকৃত ইষ্টদেবতা যিনি, তিনি অকিঞ্চনগুরু এবং প্রত্যেক মানবসন্তানেরই অন্তরে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। যতদূর বোঝা যায়, আমাদের দেশে তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব অবধি দীক্ষা লওয়ায় কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে। বর্ত্তমানে এদেশে তান্ত্রিক দীক্ষারই সমধিক প্রাবল্য ও প্রাধান্য দেখা যায়। আজকাল কি

তান্ত্রিক, কি বৈষ্ণব, প্রাচীনপন্থী হিন্দুসমাজের সর্ব্ববিধ দীক্ষাপ্রণালীতেই দীক্ষামন্ত্র ও ইষ্টদেবতার নাম গোপন রাখিবার অনুশাসন দেওয়া হয়—মনে হয়, এই সকল গোপন রাখাই দীক্ষাদাতা কুলগুরুদিগের সমস্ত অনুশাসনের মুখ্য ভাব। এইপ্রকার গোপন রাখিবার অনুশাসনের ফলে দীক্ষার্থীর হৃদয় যে অজ্ঞানের কিরূপ ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবার পথে অগ্রসর হয় এবং সে কিরূপ কঠোর মানসিক পরাধীনতার দাসখত স্বাক্ষর করে, তাহা সহজে বর্ণনা করা যায় না। এইরূপ অনুশাসনের ফলে অযথা গুরুবাদ ও তদনুসঙ্গী শতবিধ অনাচার এই প্রাচীন জরাজীর্ণ সমাজগাত্রে এতই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, ব্রাহ্মসমাজ আজ শতবর্ষ চেষ্টার ফলেও সেগুলি সমূলে উৎপাটিত করিয়া সমাজদেহে উপযুক্ত নববল সঞ্চার করিতে পারিতেছেন না।

৯। ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষায় গোপনীয় কিছুই নাই।

ব্রাহ্মসমাজ যে দেবতাকে অন্তরে ধারণ করিয়াছে সে দেবতার নামও যেমন গোপনীয় হইতে পারে না, তাঁহার পূজার মন্ত্রও সেইরূপ গুপ্তমন্ত্র হইতে পারে না। ইহা উপলব্ধি করিয়া ব্রাহ্মসমাজ স্বভাবতই প্রচলিত দীক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বপ্রথম দীক্ষার ভাব সুস্পষ্ট বুঝাইয়া প্রকাশ্যভাবে দীক্ষাগ্রহণ করিবার প্রথা প্রচলিত করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ইহা বুঝাইয়া দিলেন, ইষ্টদেবতা যিনি, কতকগুলি শব্দের অর্থবোধ না করিয়া সেগুলির আবৃত্তিমাত্রই তাঁহাকে পাইবার পথ নহে। অন্তরের দেবতা যিনি, একমাত্র কুলগুরু ও তাঁহার মুখনিঃসৃত শব্দের উপর, বুঝি বা না বুঝি, অটল বিশ্বাস তাঁহার নিকট পৌঁছিবার প্রশস্ত পথ নহে। ব্রাহ্মসমাজ বুঝাইলেন বিশ্ববাসী প্রত্যেক মানবের অন্তরে মঙ্গলময় পরম দেবতারূপে যিনি চির বিরাজিত, যিনি পাপী-তাপী, সাধু-অসাধু বিশ্ব-জগতের একটি মানবকেও পরিত্যাগ করেন নাই, প্রত্যুত প্রেমপূর্ণ আহ্বানে প্রত্যেক মানবকেই নিজের অভিমুখে নিত্যই আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার নিকটে সরল পথে পৌঁছিবার জন্য যে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, তাহার মন্ত্রে গোপনীয় কোন কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। প্রত্যেক মানবসন্তান কোন কিছুর অভাব বা কোন কিছুর প্রয়োজন বোধ করিলে অথবা কোন কারণে প্রাণে তীব্র আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলে যেমন সহজেই পিতামাতার নিকট উপস্থিত হইতে পারে, সেইরূপ বিশ্ববাসী প্রত্যেক মানব প্রত্যেকের ইষ্টদেবতা বিশ্বপিতা ও অখিলমাতা পরমেশ্বরের নিকট প্রাণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকিলে সহজেই উপস্থিত হইতে পারে—তাহাতে এতটুকু বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। ভগবানের চরণে উপস্থিত হইবার জন্য পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই, মনীষার প্রয়োজন নাই—চাই কেবল প্রাণের গভীর ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা। পিতামাতার নাম গোপন রাখিবার অথবা পিতামাতার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য সরল পথ ধরিবার নিষেধবিধানে কে আস্থা প্রদর্শন করিতে পারে? সেইরূপ আমরা ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, যে দীক্ষাপ্রণালী প্রাণের ইষ্টদেবতার নাম অথবা তাঁহার নিকটে পৌঁছিবার সরল পথনির্দ্দেশক মন্ত্র গুপ্ত রাখিবার অনুশাসন দেয়, সেই দীক্ষাপ্রণালী নিশ্চয়ই অমৃতসিক্ত নহে।

১০। ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষাপ্রণালীর উদারতম ভিত্তি।

ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে ব্রহ্মদীক্ষা প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহার জন্য যেমন বাহ্যাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, সেইরূপ অভ্রান্ত গুরুরও কোনও অপেক্ষা নাই। দীক্ষার্থীর প্রাণে তাঁহাকে পাইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং অকিঞ্চন-গুরুরূপে দীক্ষার্থীর হৃদয়ে আবির্ভূত হন; এবং তাহার অন্তরে স্বহস্তে জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত করিয়া সরলপথে নিজের অভিমুখে তাহাকে পরিচালিত করেন। ব্রাহ্মসমাজ যে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন, তাহা কেবল তোমার বা আমার জন্য নহে কিন্তু বিশ্ববাসী প্রত্যেক মানবেরই জন্যে। সেই কারণে সেই সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মসমাজ যে দীক্ষাপ্রণালী ও তাহার মন্ত্র জনসমাজে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই দীক্ষাপ্রণালী ও মন্ত্র স্বভাবতই উদারতম ভিত্তির উপর সংগঠিত—সেই দীক্ষাপ্রণালীর মধ্যে গোপনীয় কোন কিছুই নাই, অথবা তাহার মন্ত্র গুপ্তমন্ত্র নহে এবং তীব্র আকাঙ্ক্ষা আসিলেই দীক্ষার্থী যে কোন উপযুক্ত সাধক ও জ্ঞানী সাধু-পুরুষের নিকট উক্ত মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিতে পারেন।

১১। ব্রাহ্মসমাজের দীক্ষামন্ত্রের মূলভাব।

সেই দীক্ষামন্ত্রের মূল অবলম্বন মাত্র দুইটী—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। দীক্ষার্থীকে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার আত্মা যেমন তাহার দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণু ব্যাপ্ত করিয়া কিন্তু তাহা হইতে পৃথক্‌স্বরূপে অবস্থিতি করে, সেইরূপ সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বনিয়ন্তা অনন্তস্বরূপ অদ্বিতীয় ও অপ্রতিম পরমাত্মা এই বিশ্ব-জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুর মধ্যে এবং প্রত্যেক জীবাত্মার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে কিন্তু পৃথক্‌স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি আমাদের প্রত্যেকের করুণাময়ী মাতা ও স্নেহময় মঙ্গলবিধাতা পিতা। তাঁহার ও জীবাত্মার মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান নাই। তাঁহাকে পাইতে চাহিলে সমস্ত হৃদয় দিয়া তাঁহাকে প্রীতি করিতে

হইবে এবং যে সকল কার্য্য তাঁহার প্রিয়, অনুরাগের সহিত সেই সকল কার্য্যই সাধন করিতে হইবে। ইহাই হইল ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তিত দীক্ষাপ্রণালী এবং ইহাই হইল তাহার মন্ত্র। এই মন্ত্র কেবলমাত্র তাঁহার নিকট পৌঁছিবার সরল পথের নির্দ্দেশক দিক্‌দর্শন যন্ত্রমাত্র। সেই কারণে ইহার মধ্যে সীমাবদ্ধ মূর্ত্তিপূজার কোনপ্রকার ছায়া অথবা অভ্রান্ত গুরুবাদ প্রভৃতির ভ্রান্ত মতবাদ অর্গলরূপে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে না।

১২। মহর্ষিদেবের দীক্ষায় শিক্ষণীয়।

আজ যাঁহার দীক্ষা গ্রহণ করিবার দিন, তাঁহার জীবনের অনুধ্যানে যদি আমরা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকি ও হইতে চাই, তবে আমাদের প্রাণে ভগবানকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা তীব্ররূপে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে এবং সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রাণের অন্তরে বরণ করিয়া উহারই দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা-গ্রহণের সার্থকতা যদি জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, তবে মূর্ত্তিপূজা ও তদনুসঙ্গী গুরুবাদ প্রভৃতি শতবিধ গণ্ডী চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া একনিষ্ঠভাবে ভগবানের চরণতলে অগ্রসর হইতে হইবে, আমাদের সমস্ত জীবন তাঁহারই চরণে সমর্পণ করিতে হইবে। অপ্রতিম পরমাত্মাকে সত্যই আমাদের পিতামাতা বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইলে চলিবে না। পাপী-তাপী সাধু-অসাধু-নির্ব্বিশেষে সকল মানবকেই তাঁহার পূজার মন্ত্র অকুণ্ঠিতচিত্তে বিতরণ করিতে হইবে। প্রত্যেক মানবকেই তাঁহার নিকট পৌঁছিবার সরল পথপ্রদর্শনে সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। এই শুভদিনে এই শুভ কার্য্যের ব্রতগ্রহণে অগ্রসর হও।

ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করি তিনি আমাদের মস্তকে এই আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন—যেন আমাদের প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক অনুষ্ঠান তাঁহাতেই পরিসমাপ্ত হয়।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

ঝিঁঝিঁট বেহাগ—আড়াঠেকা।

হৃদয়ে মোর এস
তব চরণে প্রাণ ধাইছে হে।
জগত ভরিয়া নামি' তোমারি প্রেম
আকুল করি দিছে হে।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ ২´ ৩ ০
II র্সা। র্সা না -া পা I মপা মমা গা -া। -া -া গমা পধা। পমা গপা মপা মগা।
হৃ দ য়ে • মো •• •• র • • • এ• •• •• •• •• ••

১ ২´ ৩ ০
। রা গা -া মগা I মরা -া -া ররা। গা পা -া পমা। ধপা পা -া পা।
• স • •• • • • • তব চ • • র • ণে• • • প্রা

১ ২´ ৩ ০
। -া না -া -া I র্সা র্সা -া নর্রা। র্সা না -া পা। গমা মগা -া II
• ণ • • ধা ই • •• ছে হে • • • • •।

০ ১ ২´ ৩
পা। পা না -া না। র্সা র্রা -া -া র্সর্সা। র্রগা গর্রা র্সনা নর্সা। র্রা র্সনা র্সা -া।
জ গ ত • ভ রি য়া • • •• •• •• •• •• • না• মি •

০ ১ ২´ ৩ ০
। র্সা না -া -া। র্সর্সা র্সনা নধা পমা। পা -া -া র্রা। -া -া র্সনা র্রা। র্সা র্সা -া -া।
তো মা • • •• •• •• •• রি • • প্রে • • ম• আ কু ল • •

১ ২´ ৩ ০
। র্সা না -া র্সা। ধনা ধা র্সনা র্রা। র্সা না -া পা। গমা মগা -া II
ক রি • • দি • •• • ছে হে • • • • •

সোহিনী—সুর ফাঁকতাল।

কারণ আদি সব শক্তি মূল পরমেশ্বর
শুভদ অন্তরে তব বাণী দাও হে।
শুভাকর আদি নাথ গুণসাগর অরূপ
চরণ ধরি তব শুভমতি দাও হে।
তব করুণা বিতরিছে স্বরজ
চন্দ্র তারা পবন আদি অসুথন হে
অকিঞ্চন আমি তব প্রসাদ দেব
যাচি সদা মলিন দুখীজন হে।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী।

১´ ২ ৩ ॥ ১´ ২ ৩
ধা মা ধা II র্সা -া -া না | ধা ধা | মা -া -া মা I মা -া -া মা | গা গা | ঋা -া সা সা I
কা র ণ আ • • দি স ব শ • • ক্তি মূ • • ল প র মে • শ্ব র

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা -া গা গা | মা -া | ধা ধা মা ধা I না র্সা র্সা র্সা | র্সনা -া | -া ধা মা ধা II
শু • ভ দ অ • ন্ত রে ত ব বা ণী দা ও হে • • "কা র ণ"

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
{I মা ধা না র্সা | ঋা -া | র্সা র্সা -া র্সা I র্সা র্সা র্সা -া | র্সা র্সা | র্সা না ধা না I}
শু ভা ক র আ • দি না • থ গু ণ সা • গ র অ রূ • প

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা -া র্গা র্গা | ঋা ঋা | র্সা না র্সা র্সা I র্সা না র্সা র্সা | র্সনা -া | -া র্সনা মা ধা II
চ • র ণ ধ রি ত ব শু ভ ম তি দা ও হে • • "কা র ণ"

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা -া মা -া | মা মা | মা -া গা -া I মা ধা ধা মা | -া মা | গা -া ঋা সা I
ত • ব • ক রু ণা • বি • ত • রি • • ছে স্ব • র জ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা গা গা মা | ধা ধা | মা ধা ধা না I র্সা র্সা না না | র্সা র্সা | র্সনা -া ধা -া |
চ • ন্দ্র তা • রা প ব ন আ • দি অ সু থ ন হে • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
{I মা -া ধা -া | না -া | র্সা র্সা র্সা -া I না না র্সা র্সা | -া র্সা | ঋা না র্সা -া I}
অ • কি • ঞ্চ • ন আ মি • ত ব প্র সা • দ দে • ব •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা -া র্গা র্গা | ঋা -া | র্সঋা না র্সা র্সা I র্সা না র্সা র্সা | ঋা না | র্সা ধা মা ধা IIII
যা • চি স দা • ম • • লি ন দু খী জ ন হে • • "কা র ণ"

———

পূরবী—ব্রহ্মতাল।*

ডুবিল প্রাণ মন মর্ম সুন্দর প্রভু হেরি তোমা প্রাণে।
ভুলি সব, হৃদয় যখন পূরে তোমারি মধু নামে
ধ্বনিত করে নীলাম্বর যবে বাঁশরী তব মধু তানে।

কথা ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী।

১´ ০ ২ ৩ ০ ৪ ৫ ৬ ০

II গা -া। পা ক্ষা। গা -া। ঋা -া। সা সা। সা সা। সা -া। সা ঋা। সা ন্‌া ||

ডু · বি ল প্রা · ণ · ম ন ম র্ম সু · ন্দ র প্র ভু

৭ ৮ ৯ ১০ ০

| সা গা। গা গা। পা ক্ষা। ধক্ষা -া। গমা -া II

হে রি তো মা প্রা · ণে · · ·

১´ ০ ২ ৩ ০ ৪ ৫ ৬

I গা গা। ক্ষা ধা। পা র্সা। র্সা -া। নর্সা র্সা। র্সা না। র্সা র্সা। র্ঋা র্সা ||

ভু লি স ব · হৃ দ · · য় য · খ ন পূ রে

০ ৭ ৮ ৯ ১০ ০

| না ধনা। ধা পা। পা পা। পা ক্ষা। ধক্ষা -া। গমা -া II

তো · মা রি ম ধু না · মে · · ·

১´ ০ ২ ৩ ০ ৪ ৫ ৬

I গা -া। ক্ষা ধা। র্সা র্সা। র্সা -া। র্সা না। র্সা র্সা। র্সা র্সা। না র্ঋা।

ধ্ব · নি ত ক রে নী · লা · ম্ব র য বে বাঁ ·

০ ৭ ৮ ৯ ১০ ০

| র্সা র্সা। না ধনা। ধা পা। পা পা। ধক্ষা -া। গা মা IIII

শ রী ত · ব · ম ধু তা · নে ·

—০—

* ব্রহ্মতাল প্রাচীন তালগুলির অন্যতম। ইহার সুললিত ছন্দ সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষন করে। ইহা একরূপ লুপ্তপ্রায় বলিলেও হয়। যে সকল গুণী সঙ্গীতজ্ঞ ইহার পুনরুদ্ধারকল্পে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং এই প্রচেষ্টার জন্য তিনি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ। তঃ সং.

"চরণে"

বাহার—কাওয়ালি

চরণে শরণ দাও হে।
দীন শিশু আমি, মাতা পিতা মম তুমি—
চিরসাথী প্রাণের প্রাণ।

হৃদয়ের ব্যথা যত
কর তুমি বিদূরিত—
পারি না বহিতে।
বর্ম্মচর্ম্ম তুমি ভয় বিপদ মাঝে—
তব চরণ ছাড়ি প্রভু কোথা যাই—নাহি ঠাঁই—
হে নাথ।

কথা ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী।

ণণা পা মা II {পধপা -মপা মজ্ঞা -মজ্ঞমা I ণা -া -ধা -ণা। -পধা -নর্সনা না র্সা।
চর ণে ণ র•• •• ণ• ••দা ও • • • •• ••• হে •

। (-ণধা ণণা পা মা) }। -ণধা নাঃ নঃ র্সা। -াঃ র্সঃ র্রর্সা -া I -া ণা -ণা পমপা।
•• চর ণে ণ •• দী ন শি • শু আমি • • মা • তা•পি

। মজ্ঞা -া -া মমা। রাঃ -সঃ সা -া। -া ননা না র্সা I -া ণপা র্সা -া।
তা • • মম তু • মি • • চির সা থী • প্রা• ণে র

। -া -ণধা -ণা পা। -া ণণা পা মা II
• প্রা• • ণ • "চর ণে ণ"

II মা -া মা -া। ণা -ধা -না না। না র্সা র্সা র্সা। -া -া র্সা র্সা I
হৃ • দ • য়ে • • রি ব্য থা য ত • • ক র

I র্সা র্সা র্সা র্সা। -না র্রা র্সা -া। -ণধা -া ধঃ ধধা। ণপা -ধমা পা পা I
তু মি বি দূ • রি ত • • • • পা রিনা ব• •• হি তে

I র্সা -া র্সা ণা। -া পা মা পা। মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা। মা রা -া সা I
ব • র্ম্ম চ • র্ম্ম তু মি ভ য় বি প দ মা • ঝে

I -া সমা মমা মা। -া পা ণপা ননা। র্সা -া -া র্সর্সা। র্সা -াঃ র্রঃ র্সা I
• তব চর ণ • ছা •• ড়িপ্র ভু • • কোথা যাই • না হি

I ধপা -া -া র্সা। -া -া ণধা -ণপা। -া ণণা পা মা II II
ঠাঁই • • হে • • না• •• ন"চর ণে ণ"

মিলনের বাণী।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভারতে মহামিলনের সুমঙ্গল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। চারিদিক হইতেই মিলনের জাগরণবাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। যজ্ঞাগ্নির মধ্য হইতে সুমঙ্গল চরুহস্তে যজ্ঞদেবতা যেমন আবির্ভূত হন, সেইরূপ শতবিধ দারুণ দুঃখবিপদের আকুল ক্রন্দনধ্বনি ভেদ করিয়া মিলনের সেই জাগরণ-বাণী গর্জ্জিয়া উঠিয়া আমাদের প্রাণে আসিয়া পৌছিতেছে। দুঃখবিপদের ঘন তমসাচ্ছন্ন মেঘজাল ভেদ করিয়া ভগবানের অমোঘ করুণামূর্ত্তিতে মিলনের অরুণরশ্মি দেশের প্রাণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

যে ব্রাহ্মসমাজ মিলনের অমৃতময় বীজসকল বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বপ্রথম দেশের মধ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছিল, সেই ব্রাহ্মসমাজই আজ মিলনের পথে সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের জীবনে শতাব্দীর অধিককাল অতীত হইয়া গেল। এখনও কি আমাদের অন্তরে মিলনের সুবিমল জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে না? যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, যাঁহারা বর্ত্তমান যুগের কালোপযোগী অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন যে, আমরা যদি বিচ্ছিন্ন থাকিবার পরিবর্ত্তে পরস্পর মিলিত হইয়া শুভকর্ম্মসাধনে অগ্রণী হই, তবে ব্রাহ্মসমাজ এক আশ্চর্য্য নববলে বলীয়ান হইয়া উঠিবে। ইহার বিপরীতে আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে কার্য্য করিতে থাকিলে আমাদের বল যে কিরূপ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকিবে, আমরা জনসমাজে কিরূপ পশ্চাৎ হইতে অধিকতর পশ্চাতের আসন গ্রহণ করিতে থাকিব, তাহা আমরা দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। অনেক রোগে রোগী যেমন দিনের পর দিন যতই হীনবল হইতে থাকে, ততই সে আপনাকে আপনি বুঝাইতে থাকে যে, সে স্বাস্থ্যের অভিমুখে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে—আমাদেরও অবস্থা অনেকটা সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। বিরোধ-বিচ্ছেদের ফলে আমরা আপনাদিগের বল যতই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর করিয়া তুলিতেছি, ততই আমরা তাহা উপলব্ধি করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছি; ততই আমরা আপনাদিগকে স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া এই ভ্রান্তসংস্কারে আবদ্ধ রাখিতে চাই যে, আমরা দেশে ও সমাজে উন্নততম আসন অধিকারের পথে অগ্রসর হইয়া চলিতেছি, অথবা অধিকার করিয়া বসিয়া আছি—কেহই আমাদিগকে সে আসন হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। ভুল সম্পূর্ণ ভুল। বলক্ষয় হইতে হইতে যখন প্রাণের অভাব হইবে তখন ব্রাহ্মসমাজকে তাহার উন্নত আসন হইতে বিচ্যুত তো হইতে হইবেই, তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিবারও ক্ষমতা কাহারও থাকিবে কিনা সন্দেহ।

আমাদের ব্যক্তিগত শত মতভেদ প্রকৃত মিলনের পথে অন্তরায় হইয়া কিছুতেই দাঁড়াইতে পারে না, অন্তত দাঁড়ান উচিত নয়। ইহা অতীব সত্য কথা যে, খৃষ্টীয় বিভিন্ন সম্প্রদায় যখন গুরুতর মতভেদ সত্ত্বেও এক সাধারণ ভিত্তিতে মিলিতে পারিতেছেন, হিন্দুজাতির শাক্ত বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং শত সহস্র উপসম্প্রদায় শতবিধ মতভেদ সত্ত্বেও আবশ্যক হইলেই মিলনের প্রশস্ত ভূমির উপর দাঁড়াইতে পারেন, তখন এই বিগতবিবাদ পরমেশ্বরের উপাসকগণ কেনই বা আত্মপরনির্ব্বিশেষে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে জনসমাজকে প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট করিতে পারিবেন না? আমরা কেনই বা মতদ্বন্দ্ব ও ভেদাভেদ ভুলিয়া প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরের পতাকাতলে অক্ষুব্ধচিত্তে দাঁড়াইতে পারিব না? সত্য কথা বলিতে কি, পিতার সহিত পুত্রের, মাতার সহিত কন্যার, স্বামীর সহিত স্ত্রীর সকল বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন মিলনের সম্ভাবনা দেখা যায় না। তখন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী ব্রহ্মোপাসকগণের পরস্পরের সর্ব্বতোমুখী মিলনের আশা পোষণ করা কিছুতেই সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি না।

শত মতভেদ সত্ত্বেও—শত মতভেদ লইয়াই আমাদিগকে প্রীতির বন্ধনে মিলিত হইতে হইবে। একসঙ্গে মিলিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে চলিতে হইবে, একই মূলভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উপদেশ অনুশাসন দিতে হইবে এবং আমাদিগকে পরস্পরের সুখে সুখী ও পরস্পরের দুঃখে দুঃখী হইতে হইবে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রথম স্মৃতিসভায় ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু মিলনসাধনের যে মহামন্ত্র বিঘোষিত করিয়াছিলেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত আমার অন্তরে জলদক্ষরে লিখিত আছে। সেই মহামন্ত্রটী এই—Unity in essentials, diversity in non-essential and charity in all অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মূলভাবে এক হওয়া চাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর বিষয়ে মতভেদ যাহা হইতে পারে হউক এবং মতের যতই কেন বিভিন্নতা হউক না, সে সমস্তই উদারদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে, যথাযুক্ত সম্মান দিতে হইবে—ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না।

ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া উদারতম ভিত্তির উপর একটী ধর্ম্মসমাজ সংগঠিত করিবার সুমহান কল্পনা

* শতাধিক-দ্বিতীয় ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে ৩রা মাঘ বিবৃত।

যাঁহার হৃদয় হইতে আশ্চর্য্যরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে স্বাধীনতা ও মৈত্রীর এক অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। তিনি ব্রহ্মনামের পতাকা দেশে প্রোথিত করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বন্ধুবিচ্ছেদের ভয়ে বা আত্মীয়স্বজনের ভ্রূকুটিপ্রদর্শনে কিছুমাত্র ভীত হন নাই এবং স্বকার্য্যসাধনে পশ্চাৎপদ হন নাই। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহার লক্ষ্যসাধনের পথে, তাঁহার মহান উদ্দেশ্য ব্রাহ্মসমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার পথে তিনি একনিষ্ঠভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিলেন—তিলেকের জন্যও ফিরিয়া দেখিলেন না যে, কে নিন্দা করিল বা কে প্রশংসা করিল; ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেমন নিজেরও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন তেমনি অপরেরও স্বাধীনতায় তিনি কখনই হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হন নাই। অপরকে স্বমতে আনয়ন করিবার জন্য তিনি তাহাদের বুদ্ধিবিবেচনার উপর নির্ভর করিতেন এবং তাহাদিগকে নানা প্রমাণাদি প্রদর্শনে বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেন; কিন্তু অপরাপর ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ন্যায় ছল বল কৌশল ও কূটনীতি প্রয়োগের কথা তাঁহার অন্তরে আদৌ স্থান পায় নাই। সেই কারণেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মৈত্রীকে তাঁহার ব্যবহারের নিয়ামক করিতে পারিয়াছিলেন। ইহারই ফলে তিনি খৃষ্টধর্ম্মের যাহা সার তাহাও যেমন লইতে পারিয়াছিলেন, মহম্মদীয় ধর্ম্মের যাহা সার তাহাও যেমন আত্মস্থ করিতে পারিয়াছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের যাহা সার তাহাও তিনি তেমনই আত্মস্থ করিয়া তাহারই উপর সুমহান সত্য ধর্ম্মকে দাঁড় করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মৈত্রীকে তিনি ব্যবহারের নিয়ামক করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার লিখিত সমস্ত তর্ক-বিতর্কের ভিতর বিপক্ষের প্রতি কিছুমাত্র কটূক্তি বা অশিষ্ট-ভাষাপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাজা রামমোহন রায়ের তিরোভাবের পর ব্রাহ্মসমাজের ভার ভগবান যাঁহার স্কন্ধে সংন্যস্ত করিয়া দিলেন, সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনেও স্বাধীনতা ও মৈত্রী এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্যের উপর অবস্থিতি করিয়াছিল। ব্রহ্মকে তিনি যখন অন্তরে প্রত্যক্ষ করিলেন, তাঁহাকে জীবনের সকল কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার পথে বন্ধুবিচ্ছেদ বা আত্মীয়স্বজনের সহিত বিরোধ—কোন বিভীষিকাই বাধারূপে দাঁড়াইতে পারিল না। তিনি সকল বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া এবং প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া জীবনের সকল বিভাগে সকল অনুষ্ঠানে সর্ব্বোচ্চ আসনে ভগবানকে বসাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন, যে সকল কার্য্যে ভগবানের সহিত সংসারের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে, সেই সকল কার্য্যে অকুতোভয়ে সংসারকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের অনুচর হইয়া দাঁড়াইবে, কিন্তু যে সকল বিষয়ে সেরূপ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে না, কুলপ্রথা প্রভৃতি সেই সকল বিষয়ে পরিপার্শ্বের সহিত যথাসম্ভব মৈত্রীস্থাপন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকিবে। এইপ্রকার সামঞ্জস্যসাধনের কারণেই তিনি একদিকে নবতর দীক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া এবং ব্রহ্মোপাসনাকে গৃহ্য অনুষ্ঠানসমূহের মূলে রাখিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেমন অক্ষুণ্ণ রাখিলেন, সেইরূপ গৃহ্য অনুষ্ঠানসমূহকে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্বসমূহকে দেশের প্রচলিত ধারার সহিত অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া পরস্পরকে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন।

দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে স্বাধীনতা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল বলিয়াই তিনি নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করিতে পারিলেন যে, ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার অধিকার প্রত্যেক মানবেরই আছে—কাহাকেও সেই অধিকার হইতে কেহই বিচ্যুত করিতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের সর্ব্বপ্রথম মন্ত্রের তাৎপর্য্যে এই মহাবাণী ঘোষিত করিয়া তিনি যেমন আত্মার স্বাধীনতা সুপ্রচারিত করিলেন, সেইরূপ তিনি ব্রাহ্মমণ্ডলীকে যে "উপহার" দিয়াছেন, সেই "উপহারে" "মৈত্রীই যেন তোমাদের ব্যবহারের নিয়ামক হয়" এই সুগম্ভীর মন্ত্র সন্নিবদ্ধ করিয়া স্বীয় অন্তরে মৈত্রীভাবের সাধনার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মৈত্রীভাবের সর্ব্বপ্রধান জলন্ত সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ইহাতে বহু সম্প্রদায়ের বহুবিধ সমালোচনা প্রকাশ করিতে হইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার প্রকাশ অবধি এই উননব্বই বৎসরের মধ্যে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বা কোন ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষা বা অবজ্ঞাসূচক একটী শব্দও প্রযুক্ত হয় নাই।

তিনি দেশের তদানীন্তন প্রচলিত ধর্ম্মমতসমূহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও দেশের ধর্ম্মধারার সহিত যোগ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিলেন এবং কোন ধর্ম্ম বা উপধর্ম্মকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন না। তিনি চাহিতেন যে, তিনি যেমন স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মৈত্রীকে ব্যবহারের নিয়ামক করিয়াছেন, সেইরূপ অপর ধর্ম্মসম্প্রদায়গণও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ বিদ্রূপবাণ প্রভৃতি নিক্ষেপ করিবার পরিবর্ত্তে এবং ছলে-বলে-কৌশলে ভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে স্ব-সম্প্রদায়ে আনিবার পরিবর্ত্তে পরস্পরের প্রতি সদয় ও উদার ব্যবহারে যত্নবান হউন। ইহার বিপরীতে সেকালে ডফ প্রমুখ মিশনারীগণ রাজা রামমোহন রায়ের প্রদত্ত

সাংখ্যের কথা তুলিয়া গিয়া হিন্দুধর্মের প্রতি অযথা বিষম অন্যায় নিন্দাবাদ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া এবং নানা উপায়ে হিন্দু সন্তানদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছিলেন বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তি গত স্বাধীনতার মূলঘাতক ঐরূপ প্রণালীর বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালিত করিয়াছিলেন। এইজন্য সেকালের বিরোধজনিত ভ্রান্তসংস্কারবশতঃ কেহ কেহ তাঁহার প্রতি খৃষ্টবিদ্বেষের কথা আরোপ করিয়াছেন। এই উক্তি নিতান্তই ভ্রমসমাকুল। হিন্দুশাস্ত্রের ন্যায় বাইবেল কোরাণ প্রভৃতির প্রতি তিনি যথেষ্টই শ্রদ্ধাবান ছিলেন, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

স্বাধীনতার সহিত মৈত্রীভাব কিরূপ অবিচ্ছিন্নভাবে, কিরূপ অঙ্গাঙ্গী আকারে, কিরূপ আশ্চর্য্য সামঞ্জস্যের সহিত তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত মতভেদের কারণে সমাজঘটিত বিচ্ছেদ সংঘটিত হইবার পরেও কেশবচন্দ্রের পরলোক-গমন পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত অবিচ্ছিন্ন সখ্যবন্ধন রক্ষা করাতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

বিরোধবিবাদের কাল সুদূরে অতীত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধবিবাদের কোনই কারণ উপস্থিত নাই; বরঞ্চ আমরা সকলেই ভগবানের মিলন-পতাকা স্কন্ধে বহন করিয়া মিলন-পথের পথিক হইবার জন্য, প্রেম-পথের যাত্রী হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছি। সময় আসিয়াছে, যখন পরস্পরের সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতি উদার দৃষ্টিতে ক্ষমা করিয়া পরস্পরের সদ্ভাব ও সাধু ভাবের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত উদার মত সকল অবলম্বন করিয়া স্বাধীনতা ও মৈত্রীর সামঞ্জস্য-সাধন করিতে হইবে। এইভাবে অগ্রসর হইলেই বর্ত্তমান যুগে ভারতে মিলনের প্রথম পথপ্রদর্শক ব্রাহ্ম-সমাজেরই জয়জয়কার হইবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রপ্রমুখ ব্রাহ্মদিগের লিখিত পত্রের প্রত্যুত্তরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মিলনের জন্য যে উপদেশ-বাণী দিয়াছিলেন, আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য যে তাঁহার সেই অমূল্য উপদেশবাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া কেবল ব্রাহ্মদিগের পরস্পরের মধ্যে নহে, কিন্তু ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্যান্য প্রাচীনপন্থী হিন্দুসম্প্রদায়দিগেরও সহিত ব্রাহ্মসমাজের মহামিলন সাধনে যত্নবান্ হই। তাঁহার বক্তব্যের মর্ম্ম এই—'দেশের প্রাচীন ধারার সহিত বিচ্ছেদ সংঘটিত করা এবং যে হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের উৎপত্তি, সেই হিন্দুসমাজের প্রাচীনপন্থী সম্প্রদায়-সমূহের ব্রহ্মোপাসক সাধুপুরুষদিগকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বা ধর্ম্মসঙ্গত হইবে না'। তাঁহার মিলনবাণী কি প্রাচীনপন্থী কি নবীনপন্থী কি হিন্দুসমাজ কি ব্রাহ্মসমাজ সকলেরই পক্ষে প্রযুজ্য। তিনি বলেন—"তোমরা উভয় পক্ষই সদ্ভাবে ও সাধুভাবে মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিসাধন কর; তাঁহাদের বল তোমাদের নূতন বলে মিলিত হইয়া তাহাকে আরো পোষণ করুক, এবং তোমাদের দৃষ্টান্তে তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধিত করুক, ইহাই আমার অভি-লাষ। তোমাদের পরস্পর বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে তোমরাও অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া পড়িবে, এবং তাঁহারাও তোমাদের সাহায্য অভাবে আরো মৃদুগতি হইবেন ... ... তোমরা যে সাধু লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য ধাবমান হইতেছ, ইঁহাদেরও তাহাই লক্ষ্য। কেবল উপায় অবলম্বন বিষয়ে তোমাদের পরস্পরের মতভেদ দৃষ্ট হইতেছে।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মিলনবাণী যদি গৃহীত হইত তবে ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন অবধি শতাব্দীর মধ্যে এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত ব্রহ্মানন্দের বিচ্ছেদ অবধি ন্যূনাধিক ৬০ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ মৃদুগতি হইবার পরিবর্ত্তে কিরূপ বিক্রমের সহিত সমগ্র ভারতের অধিবাসীদিগকে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতে পারিত, তাহা কল্পনা করিলেও আমা-দের হৃদয় মন আনন্দে ভরিয়া উঠে।

এক্ষণে আমাদের পরস্পরের মধ্যে অথবা জননী-সমান বৃহত্তর হিন্দুসমাজের সহিত আমাদের বিরোধ-বিবাদ করিবার এতটুকু অবসর নাই। শত মতভেদ সত্ত্বেও আমাদের পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে হইবে। যদি আমরা আপনাদিগকে মৃত্যু ও বিনাশ হইতে বাঁচাইতে চাই, যদি আমরা আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধন করিতে ইচ্ছা করি, যদি আমরা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন পূর্ব্বক জগতের মহাসভায় উন্নত আসন অধিকার করিবার দাবী করিতে উদ্যুক্ত হই, তবে বলা বাহুল্য যে, আমাদের মিলিত ভাবেই পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া এই উন্নতি ও মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা বুঝিয়াছি যে আমাদের মিলনের অভাবই সকল দুঃখসঙ্কটের কারণ। আমরা জানিয়াছি যে আমাদের মধ্যে মিলনের অভাবই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতা ও অবনতির মূল নিদান। চিকিৎসকেরা বলেন যে, রোগের নির্ণয় হইলে অর্দ্ধেক আরোগ্যলাভ হয়, কারণ রোগের কারণ ও অবস্থা বুঝিলে ঔষধ সুনির্ব্বাচিত হইতে পারে। আমরা আমাদের বর্ত্তমান বলহীনতা প্রতি পদেই অনুভব করিতেছি এবং তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ যে আমাদের পরস্পরের পৃথক্ ও বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান ও বিচরণ, পরস্পরের সুখে দুঃখে

সহানুভূতি ও সমবেদনার অভাব, তাহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি। রোগকে চাপা দিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিলে আরোগ্যলাভ ত হয়ই না, প্রত্যুত রোগীকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে। ব্রাহ্মসমাজে ভীষণ দৌর্ব্বল্য-রোগ প্রবেশ করিয়াছে। এই রোগের কারণও আমরা বুঝিয়াছি, এবং বুঝিয়াছি যে রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া পরস্পরের মিলনসাধন—মিলনই দৌর্ব্বল্য হইতে মুক্তিলাভের এবং জীবনের পথে অগ্রসর হইবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় জানিয়া সকল দেশে সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ যদি স্বীয় রোগ হইতে আরোগ্যলাভের পথে অগ্রসর হইবার অমোঘ উপায় মিলনসাধনকে গ্রহণ না করেন, তবে ব্রাহ্মসমাজের বিনাশ ও মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই মিলনের পথে অগ্রসর হইতে হইলে পরস্পরের স্বাধীন মতামতের প্রতি যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক জনহিতকর কার্য্য-সমূহে পরস্পরের স্কন্ধে স্কন্ধ দিয়া সমগ্র জনসমাজের সহিত মিলিতভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। এইভাব অন্তর হইতে সম্পূর্ণ বিদূরিত করিতে হইবে যে, আমার সম্প্রদায়ই একমাত্র ভাল কাজ করিতে পারে, অপর কোন সম্প্রদায়ই সেইরূপ কার্য্য করিবার অধিকারী নয়। যতদূর সম্ভব প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেকে ভাবে ও চিন্তায় মিলিতভাবে অগ্রসর হইয়াই সমগ্র ব্রাহ্মসমাজকে বিজয়ী করিতে হইবে। এইভাবের সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসকের বিজয়বার্ত্তা জগতের চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইতে থাকিবে।

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন হইতে শতাধিক বৎসর অতীত হইবার পর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পথ অবলম্বন-পূর্ব্বক, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদিষ্ট সৎপরামর্শ গ্রহণ-পূর্ব্বক এবং তাঁহাদের পদানুসরণে একত্র মিলিত হইয়া সকল কর্ম্ম সাধন করিতে থাকিলে অপ্রত্যাশিত ঘটনা সংঘটিত হইতে দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সকলেই মুগ্ধনয়নে তাহাকে দেখিতে থাকিবে এবং মঙ্গলময় প্রেমস্বরূপ ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ ব্রাহ্মসমাজের মস্তকে শতধারে বর্ষিত হইবে। ব্রাহ্মসমাজ তখন অপূর্ব্ব নবতর শ্রী ধারণ করিবে এবং সুপ্তোত্থিত সিংহবিক্রমে নববলে জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

আজ মাঘোৎসবের প্রারম্ভে আমার এই যে আশা ও প্রার্থনা ভগবানের চরণে এবং ভক্তজনগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম, ভগবান অন্তর হইতে নিঃসৃত এই আশা ও প্রার্থনা সফল করুন।

নর-দেবতা।

(শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ, এই চলমান জগতে যা-কিছু চলছে, তারই সঙ্গে আমাদের মনের এবং প্রাণের চলাকে মেলাতে হ'ল তারই নাম জীবযাত্রা।

নিজের দৈহিক মানসিক চলার মূলে মানুষ যে-চালনাকে অনুভব করেচে তাকে মানুষ বলে শক্তি। তারই দৃষ্টান্তে সে স্থির করেচে জাগতিক সমস্ত চলা-ফেরার মূলে তেমনি একটি চালনাশক্তি আছে। এই শক্তির প্রকৃতি কি তাও সে নিজের প্রকৃতি থেকে বুঝে নিয়েচে। একটি মাত্র শক্তিকে সে নিজের মধ্যে অব্যবহিত ভাবে একান্তভাবে জানে, সে হচ্চে ইচ্ছাশক্তি। জগতের গোড়াকার শক্তিকেও সে ইচ্ছাশক্তি ব'লে ধরে নিয়েছিল।

কর্ম্ম ব্যাপারটা চোখে পড়ে, ইচ্ছাটা থাকে অলক্ষ্যে। এই অদৃশ্য ইচ্ছা শান্ত থাকলে কর্ম্ম শান্ত থাকে, ইচ্ছা প্রয়োজনের অনুকূল হ'লে কর্ম্ম অনুকূল, প্রতিকূল হ'লে কর্ম্ম বিরুদ্ধ হয়ে ওঠে। এইজন্য যে-ইচ্ছা নিজের বাইরে অন্যের মধ্যে, তাকে ভয়, লোভ বা প্রেমের দ্বারা বশ ক'রে নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে হয়।

জাগতিক ক্রিয়া যে ইচ্ছার চালনায় ঘটে ব'লে মানুষ স্থির করেচে তাকে নিজের আনুকূল্যে আনবার বিবিধ প্রক্রিয়ায় মানুষের পূজা আরম্ভ। জগতের শক্তিকে নিজের শক্তির সহায় করবার এই সাধনাকে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রথম সোপান ব'লে ধরা যেতে পারে।

মানুষ নিজের মধ্যে একটা বৈপরীত্য দেখেচে। দেখেচে যে তার কর্ম্ম স্থূল কিন্তু কর্ম্মের উদ্ভব যে ইচ্ছা সেটা ইন্দ্রিয়বোধের অতীত। রূপধারী তার দেহ কিন্তু দেহের গভীরে যে প্রাণ তা অরূপ। চারিদিকের বস্তু তার প্রত্যক্ষ কিন্তু যে মনের কাছে সেই বস্তু গোচর হচ্চে সে নিজে অগোচর।

এর থেকে মানুষের এই প্রত্যয় জন্মেচে বাস্তব ব'লে যা-কিছু সে দেখচে জানচে সেই দেখা-জানার মধ্যেই তা চরম নয়, এমন কিছুকে সে আশ্রয় করে আছে যা দেখা-জানার মূলে। মানুষ নিজেকে যদি একান্ত বাইরে থেকেই দেখে তবে দেখতে পাবে পরে পরে কতকগুলি কর্ম্ম ও ছবি। মানুষ পদার্থের বাস্তব প্রমাণ এর বেশি আর কিছু নেই। কিন্তু এই সমস্ত কর্ম্ম ও ছবির চেয়েও নিঃসংশয় ও অব্যবহিতভাবে এমন একটি সত্যকে সে জানে, যে সত্য তার সমস্ত কর্ম্মকে ও প্রত্যক্ষ প্রকাশকে সম্বন্ধযুক্ত ক'রে তুলেচে। এই হচ্চে তার আত্মোপলব্ধি।

এই যে নিজের মধ্যে ঐক্যোপলব্ধি, এই উপলব্ধিকে মানুষ আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছাড়িয়ে অনেক দূরে নিয়ে গেচে। এমন কথা বলেচে, যে মানুষ নিজের মধ্যে সকলকে ও সকলের মধ্যে নিজেকে জানেন তিনিই সত্যকে জানেন। যে ঐক্যতত্ত্ব তার নিজেকে অখণ্ড করেচে সেই তত্ত্বই অন্যের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করেচে।

বস্তুকে বিশ্লেষণ ক'রে তার উপাদানবাহুল্য দেখা যায় কিন্তু সম্বন্ধকে বিশ্লেষণ করা যায় না, তা এক, তা সৃষ্টির মূল রহস্য। বস্তুকে সন্ধান করতে করতে তার মূলে গিয়ে পাওয়া যায় একটি বিদ্যুতমণ্ডল, সেই মণ্ডলের কেন্দ্রে আছে ধনাত্মক বৈদ্যুতাণু ও সেই কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরচে ঋণাত্মক বৈদ্যুতাণু। এই আবিষ্কারটি পরম বিস্ময়কর কিন্তু তার চেয়ে বিস্ময়কর এদের সম্বন্ধ-সূত্র। এই সম্বন্ধের বিচিত্র লীলা অনুসারে বৈদ্যুত-কণার নৃত্য ভিন্ন ভিন্ন ধাতুরূপ ধারণ করচে। আবার সেই মূল ধাতুগুলি একটি নিরবচ্ছিন্ন বিরাট সম্বন্ধযোগে জগতটাকে সংঘটিত করেচে। এই ক্রিয়াশীল সম্বন্ধই বিচিত্রতাকে সৃষ্টি করে, আবার সেই বিচিত্রতার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে তাকে একের যোগে যুক্ত করে থাকে।

এই কথাটিই আছে ঈশোপনিষদে—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। বিচিত্র ক্রিয়াশীল জগতকে এক সত্য অধিকার ক'রে আছেন। নিজের আত্মায় আমরা এই সত্যেরই আভাস পাই। এই আত্মা আমার সম্পর্কীয় অসংখ্য নানাকে অধিকার ক'রে এক। তারই যোগে আমার সমস্তকিছু সম্বন্ধযুক্ত। এই পরম রহস্যময় সম্বন্ধকে যাঁরা যত ব্যাপক ক'রে উপলব্ধি করেচেন সত্যকে তাঁরা তত বড় ক'রে জেনেচেন।

যে সত্যকে আমরা কেবল শক্তিরূপে জানি, প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই আপন শক্তির সঙ্গে তার যোগসাধন করি। আমরা চাই অন্ন। কিন্তু এইখানেই ত শেষ হ'ল না, আরও একটা মস্ত চাওয়া বাকী রইল। বিনা প্রয়োজনে মানুষ চায় আনন্দ,—এই আনন্দের পূর্ণতা পায় যার কাছে, সে শক্তি নয় সে ব্যক্তি। সেই ব্যক্তির সঙ্গে আপন ব্যক্তিস্বরূপের পূর্ণ মিলনেই অহৈতুক তৃপ্তি।

ডাক্তারের কাছে যখন যাই তখন ডাক্তারকে দেখি শক্তিরূপে, আরোগ্যশক্তি। তার কাছে প্রয়োজনসিদ্ধির দাবি। কিন্তু বন্ধুত্বের টানে সেই ডাক্তারের কাছে যখন যাই তখন তাকে দেখি ব্যক্তিরূপে। তখন তার মধ্যে আত্মা আপন আত্মীয় সম্বন্ধ অনুভব করে। এই সম্বন্ধ অনির্ব্বচনীয়, এই সম্বন্ধ সকল সৃষ্টির মূলে। এই সম্বন্ধের অন্তরতম উপলব্ধিকেই বলে প্রেম। এর কাছে সকল প্রয়োজন গৌণ হয়ে পড়ে। তখনই বলা সহজ হয়, "মা গৃধঃ", লোভ ক'রো না।

কেন না, এই অন্তরতম সত্য-সম্বন্ধের যে সম্ভোগ, সে ত্যাগের দ্বারা, আপনাকে দিয়ে। যেখানে শক্তির দরবার সেখানে নেবার দাবি, যেখানে প্রেমের আহ্বান সেখানে আপনাকে দেবার ঔৎসুক্য। না দিতে পারলে মিলনের মাঝখানে নিজেই আড়াল হয়ে দাঁড়াই। যতক্ষণ ব্যক্তিস্বরূপে না আসি ততক্ষণ ধনের মূল্য পরিমাণে। তাকে মাপা যায়, গণা যায়, ভাঙ্গা যায়। ব্যক্তিস্বরূপে এসে পৌঁছলে তার ঐশ্বর্য্য আনন্দে প্রেমে। লোভ আশ্রয় করে অর্থকে, আনন্দ আশ্রয় করে পরমার্থকে, যাকে ইংরাজীতে বলে Value।

অর্থ নিয়ে আছে বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ রাজা, বিশেষ ধনী। পরমার্থ আছে বিশ্ব-ব্যক্তির অধিকারে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোঝা যাবে। বীণা যন্ত্রটা আছে অর্থের কোঠায়। তাকে নিয়ে দরদস্তুর, কাড়াকাড়ি, মামলা-মকদ্দমা চলে। কিন্তু গীতমাধুর্য্য আছে পরমার্থ-শ্রেণীতে; তার ভোগ নিয়ে সীমানার লড়াই নেই। অবারিত বিশ্বজনীনতাতেই তার সম্মান। বীণার অধিকার নিয়ে যেখানে আমার অহঙ্কার সেখানে আমি ব্যক্তিবিশেষ—সঙ্গীতের রস নিয়ে আমার যে আনন্দ সেই আনন্দ আমার অন্তরঙ্গ বিশ্বমানবের; সে আনন্দ সকল কালের, সকল জনের। মাথা গণতি হিসাবে প্রত্যেক মানুষই যে তাতে সুখ পায় তা নয়, কিন্তু সেই সুখেরই সদাব্রত তার, কোনো বিশেষ মানুষ যদি বঞ্চিত হয় তবে সেটা শিক্ষার অভাব, বোধের জড়তা, বিকৃত অভ্যাস প্রভৃতি কোনো আকস্মিক অপূর্ণতা বশত।

নিখিল পুরুষের ব্যক্তিরূপকে যদি নিজের ব্যক্তিরূপের মধ্যে নিবিড় প্রেমে উপলব্ধি করি, তা'হলেই বাহিরের ব্যক্তি-বিশেষের ধনে যে লোভ তার বন্ধন কাটে। সংসারে তার প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। ত্যাগী যাঁরা তাঁরা আত্মীয় সম্বন্ধকে বিরাটের মধ্যে পেয়েচেন বলেই ত্যাগী। তাঁরাই মৈত্রেয়ীর মত সহজে বলতে পারেন—যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্। এই কথাটাই ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।

ঈশ আছেন চলমান জগতের সমস্ত-কিছুকে অধিকার ক'রে, অতএব ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, কারও ধনে লোভ করবে না।

এই পরিব্যাপক পরম সত্য সম্বন্ধে ঈশোপনিষৎ বলেচেন, তাঁকে যারা একান্ত সীমাবদ্ধভাবে দেখে তাদের মন তমসাবৃত হয়। কিন্তু যারা তাঁকে একান্ত অসীম-

ভাবে দেখে তাদের অন্ধকার আরও বেশী। যারা সীমাকে অসীমকে মিলিয়ে দেখে তারাই সত্যকে জানে। অর্থাৎ এই পরমপুরুষ বিশেষের মধ্যেও এবং বিশেষকে অতিক্রম করেও। বিশেষকে একেবারে না-ক'রে দিয়ে যে-অসীম সে সম্পূর্ণ অন্ধকার ছাড়া কিছুই নয়।

মানুষের সত্তাও দেখি দুই কোটিকে স্পর্শ ক'রে আছে। একদিকে তার স্বভাব, আর একদিকে বিশ্ব-ভাব। স্বভাবে সে পশুর স্বজাতীয়; প্রাণরক্ষা ও বংশরক্ষার উপযোগী প্রবৃত্তি দ্বারাই সীমাবদ্ধ; এখানে তার অঞ্জলি আছে গ্রহণ করবার অভিমুখে। বিশ্বভাবকে নিয়ে তার মানবধর্ম্ম, এখানে সর্ব্বমানবের সত্য সে আপনার মধ্যে উপলব্ধি করে, যে-মানব ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে অধিষ্ঠিত। এখানে তার অঞ্জলি দানের দিকে। এখানে তার সাধনা এই যে, সম্পূর্ণ ভাল হ'তে হবে, শোভন হ'তে হবে, অর্থাৎ তার স্বভাবকে উৎসর্গ করতে হবে বিশ্বভাবের কাছে, প্রাণকে নিবেদন করতে হবে অমৃতের জন্যে; যথার্থ পাওয়া পাবে ব'লে ত্যাগ করতে হবে, যথার্থ বাঁচা বাঁচবে ব'লে মরতে হবে।

যাকে আমরা ভাল বলি সে জিনিষটি বিশেষ মানুষের অধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। অর্থে এই ভাল নয়, এই ভালো পরমার্থে—এই ভালর সম্বন্ধ সকল মানুষকে নিয়ে। এর জন্যে প্রার্থনা রাজার কাছে নয়, ধনীর কাছে নয়, পরমপুরুষের কাছে। তাঁহাকেই বলি "যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব।" যা ভাল তাই আমাদের দাও। তাই ঋষি বলেচেন, "বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।" যে দেবতা বিশ্বের আদিতে অন্তে, (অর্থাৎ নিখিলকে সম্বন্ধযুক্ত ক'রে আছেন) তিনিই আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধির দ্বারা যোগযুক্ত করুন।

অন্য জীবজন্তুর প্রয়োজনবুদ্ধি আছে—কেবল মানুষেরই শুভবুদ্ধি। তার কারণ, মানুষই অন্য সত্তার উপলব্ধির সঙ্গে যে-পরিমাণে এক ক'রে দেখে সেই পরিমাণেই সে মহামানুষ মহাত্মার পরিচয় দেয়। ধনী হতে হবে এ ইচ্ছা মানুষের বিষয়বুদ্ধিতে, ভাল হ'তে হবে এই ইচ্ছা তার ধর্ম্মবুদ্ধিতে। অর্থাৎ এইটেতেই তার সত্য মানবপ্রকৃতি প্রকাশ পায়। পূর্ব্বেই শাস্ত্রবাক্যে বলা হয়েচে, যে-মানুষ অন্যের মধ্যে নিজেকে ও নিজের মধ্যে অন্যকে জানে সে-ই সত্যকে জানে।

এমন আশ্চর্য্য কথা কেবল মানুষই বলতে পেরেচে, অন্য কোন প্রাণী পারে নি। এবং এই আশ্চর্য্য কথাটির পরেই তার ধর্ম্মসাধনার প্রতিষ্ঠা। সকলকে নিয়ে মানুষ, এইটিকে অভিব্যক্ত করবার জন্যেই তার যত কিছু ধর্ম্মমত।

ধর্ম্মের সাহায্যে মানুষ মুক্তিকামনা করেচে। কিসের থেকে মুক্তি? যা অসত্য তার থেকে। কি অসত্য? অন্য জন্তুর মত নিজের সত্তাকে আর-সব থেকে পৃথক জানার বুদ্ধি অসত্য। বিরাট পুরুষের মধ্যে মানুষ সত্য। সেই জন্যেই মানুষকে পূর্ণতা চাইতে হবে ভালর মধ্যে, সুন্দরের মধ্যে, প্রেমের মধ্যে—অর্থাৎ অন্তরতম বিশ্ব-বোধের মধ্যে। যে-সব প্রবৃত্তিকে রিপু বলা যায় তারা পশুধর্ম্ম থেকে মানবধর্ম্মে মানুষকে মুক্তি দেবার বিরুদ্ধে শত্রুতা করে।

মানুষ এই আশ্চর্য্য কথা বলেচে ত্রে এবং সে এই দুইটিকে নিয়ে তার পরম ঐক্যের ক্ষেত্র।

এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ

এষোঽস্য পরমো লোকঃ এষোঽস্য পরম আনন্দঃ।

ইনি এর পরমা গতি, ইনি এর পরমা সম্পৎ, ইনি এর পরমা আশ্রয়, ইনি এর পরম আনন্দ। পশুর পক্ষে ত্রে আছে, সে নেই, তাই পরমের কোন অর্থ নেই। তার গতি, তার সম্পদ, তার আশ্রয়, তার আনন্দ, তার স্বভাবের সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যেই। মানুষের যা পরম তা মহান্ পুরুষকে নিয়ে। সেখানে তার গতি কোনো সুযোগকে নিয়ে নয়, তা'র সম্পদ অর্থকে নিয়ে নয়, তা'র আনন্দ ভোগসুখ নিয়ে নয়। এখানে তার আনন্দ সেই গভীর সম্বন্ধকে নিয়ে যে-সম্বন্ধে সকলের যোগে সে সত্য। মানুষের অমরত্ব নিয়ে অনেক মত অনেক তর্ক। উপনিষৎ কাল-গণনামূলক অমরতার কথা বলচেন না। উপনিষৎ বলেন, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি—যাঁরা এঁকে জানেন তাঁরা অমৃত হ'ন। কে তিনি?

এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ—

তিনি সেই দেবতা যাঁর কর্ম্ম সকলকে নিয়ে, সকলের আত্মায় যিনি মহাত্মা, সর্ব্বদা যিনি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ—মৃত্যুভয় দুঃখ দেবে না আত্মা যদি সেই বেদনীয় পুরুষকে আত্মীয় জানে। স্বতন্ত্র আমিই মরে, কিন্তু সকলকে নিয়ে যিনি আছেন তাঁর সঙ্গে যোগে আমার মৃত্যু নেই। ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, ত্যাগের দ্বারা সর্ব্বব্যাপী পুরুষের মধ্যে আনন্দ পাও, লোভ যাবে কেটে; তং বেদ্যং পুরুষং বেদ, সর্ব্বব্যাপী পুরুষের মধ্যে আপনাকে জানো, মৃত্যুভয় যাবে দূরে। সীমাকে নিয়ে লোভ,

ভূমাকে নিয়ে আনন্দ, সীমার মধ্যে মৃত্যু, ভূমার মধ্যে অমৃত। ভোগকে সত্য করো ভোগকে বর্জ্জন না করে, সীমাকে বর্জ্জন করে। আনন্দভোগই ব্যক্তিস্বরূপের (পার্সোনালিটির) চরম ইচ্ছা। এই ইচ্ছাকে পরমের অভিমুখে না নিয়ে গিয়ে সঙ্কীর্ণের মধ্যে অবরুদ্ধ করলেই যত মারামারি কাটাকাটি। সত্য ইচ্ছাতেই শান্তি। সত্য ইচ্ছা সেই পরম পুরুষের ইচ্ছা যাঁর ইচ্ছা সকলকে নিয়ে। তাঁর ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা করার সাধনাকেই বলি ধর্ম্ম-সাধনা। ভালো হওয়া তাকেই বলে। এই ভালোর ইচ্ছা মানবের ধর্ম্ম।

নিজের জীবনে পরিপূর্ণ পুরুষের সাধনাই নানা নামে নানা ধর্ম্মরূপে স্বীকৃত। যিশু বলেচেন, আমি মানুষের পুত্র, পরিপূর্ণ মানুষের মধ্যে আপন পুত্রত্ববোধ তিনি একান্ত ভাবে অনুভব করেচেন, তাই বলতে পেরেচেন দীনতম মানুষকে অন্ন যে দেয় সে আমাকেই দেয়।

এতক্ষণ এই বলবার চেষ্টা করেছি যে, যে-পূর্ণপুরুষ "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ," তিনি বিশেষভাবে মানবিক, তাঁর মধ্যে মানব-সম্বন্ধের চরমোৎকর্ষ। তাই তাঁকে বলি "পিতৃতমঃ পিতৃণাং," তাঁকে বলি "স এব বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা" তিনিই বন্ধু, তিনিই পিতা, তিনিই বিধাতা।

সূর্য্যে আগুনে বাতাসে যে জাগতিক ক্রিয়া তার মধ্যে ভালমন্দর আদর্শ নেই, তার মধ্যে মানব-সম্বন্ধের তৃপ্তি নেই। তার সঙ্গে আমাদের বিজ্ঞানের সম্বন্ধ, ব্যবহারের সম্বন্ধ; কিন্তু প্রেমের সম্বন্ধ, সেবার সম্বন্ধ নয়। অর্থাৎ সেখানে আমাদের অর্থ, কিন্তু পরমার্থ নয়।

একসময়ে জাগতিক শক্তির কাছ থেকে অন্ন, ধন ও শত্রুপরাভবের প্রত্যাশা করেছিলুম; বিজ্ঞানের কাছে আজও সেই প্রত্যাশা করে থাকি। কিন্তু যখন থেকে প্রেয়ের উপরে শ্রেয়কে বড় করেচি, অর্থের উপরে পরমার্থকে, তখন থেকে যাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা তিনি মানবিক। তাঁর সঙ্গে ব্যবহারের যোগ নয়, ভালোবাসার যোগ। সংসারযাত্রায় সিদ্ধিলাভ জাগতিক নিয়মে, আত্মার চরিতার্থতালাভ পরমাত্মার প্রেমে। বৈষয়িক অভাব, সাংসারিক ব্যর্থতা দ্বারা তার ন্যূনতা ঘটে না—সেই প্রেমের পূর্ণতা প্রেমেরই মধ্যে।

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি।" পরমাত্মাকে ভালবেসে উপাসনা করতে হবে, যিনি তাঁকে ভালবেসে উপাসনা করেন তাঁর প্রিয় মরণধর্ম্মী হন না। নির্গুণ সত্তা বলে যদি কোনো পদার্থ থাকা সম্ভব হয় তবে তার প্রতি প্রেমের কোনো অর্থ নেই। মানবিক গুণের পরমতা যাঁর গুণে, মানুষ তাঁকেই এমন প্রেম দিতে পারে যা সকল প্রেমের উপরে।

এই প্রেমের সত্য প্রমাণ কোথায়? ভাবুকতায় নয়, বিশ্বকর্ম্মে। সাধকের সংজ্ঞা এই—"আত্মরতিঃ ক্রিয়াবান্," পরমাত্মায় তাঁর আনন্দ; কিন্তু সেই আনন্দ ক্রিয়াবান, ভাবরসে অন্তর্বিলীন নিষ্ক্রিয়তা নয়।

"সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্, তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ।" ভগবান সর্ব্বব্যাপী, অতএব তিনি সর্ব্বগত কল্যাণ। তাঁকে প্রিয় ব'লে যে উপাসনা করবে সেই পরম প্রিয়ের সঙ্গে তার যোগ হবে সকলের কল্যাণ কর্ম্মে।

পরমপুরুষকে কেন মানবিক বলচি এই কথাটাকে স্পষ্ট করা চাই। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখতে পাই, এই দেহ অসংখ্য পৃথক জীবকোষের সমবায়। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবনক্রিয়া, আয়তনের অনুপাতে পরস্পরের মধ্যে তাদের ব্যবধান যথেষ্ট। শুধু দেশের ব্যবধান নয়, কালেরও ব্যবধান। যে-সব জীবকোষ অতীত, আর যারা এখনও আসেনি, এই দেহ তাদের মধ্যেকার সেতু। বস্তুত এই দেহের অধিকাংশই বর্ত্তমানে নেই।

এই জীবকোষগুলি একদিকে স্বতন্ত্র, অন্যদিকে সমগ্র দেহের সম্পর্কে বিশ্বতন্ত্র। সমস্ত দেহের সম্বন্ধেই তারা সত্য, একান্ত পার্থক্যে তারা নিরর্থক, সমস্ত দেহের কাছে সম্পূর্ণ আত্মদানের দ্বারা তারা সার্থক।

কল্পনা করা যাক্ এই সমস্ত জীবকোষের একটা সাধনা আছে। সে সাধনা কি হ'তে পারে? দেহাত্মবোধের সাধনা। মনে করা যেতে পারে সমগ্র দেহ ব'লে একটা কিছু আছে এ বোধ তাদের অধিকাংশেরই নেই। যদি মনে করা যায় তাদের মধ্যে কেউ সমগ্র দেহের অনুভূতি নিশ্চিতরূপে পেয়েচে, তাহ'লে সন্দেহ নেই যে সেই অনুভবে তার অবরুদ্ধ চৈতন্য একটি বিরাট সত্যের মধ্যে মুক্তিলাভ করে। এই মুক্তির আনন্দ সমগ্র দেহের কর্ম্মকে আপন কর্ম্মরূপে সচেষ্টভাবে গ্রহণ করে। সমগ্র দেহে তার আনন্দ, সমগ্র দেহের কর্ম্মে সে ক্রিয়াবান।

এমনি করেই মহামানবের চেতনা যাঁর কাছে বাধাহীন, তিনি জানেন মানুষে মানুষে যে ব্যবধান আছে সে ব্যবধানটি একটি সক্রিয় অদৃশ্য সম্বন্ধের দ্বারা অধিকৃত। এই সম্বন্ধের স্বভাব হচ্চে আনন্দ, অর্থাৎ প্রেম। সম্বন্ধের পূর্ণতাতেই আনন্দ, তাকেই বলে প্রেম। তাই উপনিষৎ বলেন, "কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" আকাশ, যাকে শূন্য মনে করি, তা যদি আনন্দময় সম্বন্ধের দ্বারা বিরাজিত না থাকত, তাহ'লে কেই-বা প্রাণচেষ্টা করত। বাইরে

থেকে মনে হয় পৃথক্ প্রাণচেষ্টা, সেটা সম্ভবপর হয়েচে একটি সর্ব্বব্যাপী সত্যসম্বন্ধের যোগ।

এই সম্বন্ধ-তত্ত্ব মানুষের মধ্যে শক্তিমান হয়েচে ব'লেই মানুষের দ্বারা সমাজসৃষ্টি সম্ভব হ'ল। সমাজে মানুষের প্রয়োজন সাধন হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রয়োজন-সম্বন্ধের চেয়ে সত্যতর আনন্দের সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধটি যদি সমাজে কাজ না করে তবে কেবল স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা কোন সমাজ বেশী দিন টেঁকে না। দশের প্রয়োজনের চরমে নিজের প্রয়োজন, সমাজের ব্যাখ্যায় মানুষ এমন কথা ব'ল্‌তে পারে না। তা যদি বল্‌ত তাহ'লে দশের প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে :নিজের মৃত্যু বা চরম ক্ষতি স্বীকার করত না। সমাজে প্রয়োজনসিদ্ধির স্থান আছে, কিন্তু সেটা বাহিরের এবং তা নিয়ে বিরোধ বেধে ওঠে। এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর স্বার্থে প্রতিদ্বন্দিতা ঘটে, ধনিকে কর্ম্মিকে লাগে হানাহানি। এই ক্ষেত্রে সমাজ নিজের ধর্ম্মকে আঘাত করে ব'লেই আত্মঘাতী হয়। তখন সে "মা গৃধ" এই বাণীকে উচ্চারণ করতে পারে না, কেননা, যে বিরাট পুরুষের আসন সমস্ত সমাজকে ব্যাপ্ত করে ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ তাঁর উপলব্ধিকে খণ্ডিত করে। সমাজ মরে এই রাস্তায়।

সমাজে আর একটি বাহ্যিকতা আছে, তারও আতিশয্যে বিপদ। সে হচ্চে আচার। প্রেমে সত্যের উপলব্ধি পূর্ণ হয় তাই মিলন সেখানেই, শান্তি সেখানে। আচার সত্যের চেয়ে প্রবল হ'য়ে উঠে সর্ব্বব্যাপী যে ভগবান সর্ব্বগত শিব তাঁকে অতিক্রম ক'রে নিজেকে দাম্ভিকতার সঙ্গে প্রচার করে, সমাজেরই দোহাই দিয়ে সমাজের নিত্য ধর্ম্মকে খর্ব্ব করতে থাকে। তখন আচারীতে আচারীতে সর্ব্বনাশ বাধে। বিষয়ের অভিমান যেমন, আচারের অভিমানও তেমনি। বৈষয়িকতা সর্ব্বজনীনতার বিরুদ্ধ, আচারিকতাও তাই। আচার সাম্প্রদায়িক অহংবুদ্ধিকে প্রবল করে, এই অহং-এর তাপ ব্যক্তিগত অহং-এর চেয়ে বেশী বই কম নয়। একথা মনে রাখা চাই যে, সেই সকল প্রবৃত্তিতে আমরা পরস্পরকে নিষ্ঠুর ক'রে মারি যারা বিশ্বমানবের বোধকে বাধা দেয়। সাধারণতঃ ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রতন্ত্রে এই বাধা পদে পদে। এই কারণে বড় বড় নামের আড়ালে মানুষ মানুষকে যেমন সাংঘাতিক পীড়া দেয় এমন আর কিছুতে নয়। মানুষের যিনি দেবতা তাঁর বোধ বাধাগ্রস্ত হ'লে মানুষকে মারবার জন্যে ঠকাবার জন্যে ধার্ম্মিক নরনারীরা মানৎ দিয়ে থাকে।

দেবতাকে মানুষ ডেকেচে, পিতানোঽসি, তুমি আমাদের পিতা। পিতা নামের মধ্যে মানবের বোধ প্রকাশ পায় একথা মানতেই হবে। পিতা নো বোধি—প্রার্থনা এই যে, তুমি পিতা এই বোধটি সত্য হওয়ার সঙ্গে সকল মানুষের মধ্যে আত্মীয়তার বোধ স্বীকার করতে হবে। মানুষ-মারা লড়াই করতে যাবার পূর্ব্বে একথা বলার মতো কপটতা ও অপরাধ আর নেই—যে তুমি আমাদের পিতা। এতে মানবের পিতাকে দানব বলাই হয়। আমরা যেন জিতি এ দাবি আমাদের দলের লোকের কাছে, আমরা যেন মিলি :এ প্রার্থনা তাঁর কাছে যিনি সর্ব্বগতঃ শিবঃ। স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু, তিনি আমাদের পরস্পরকে শুভবুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত করুন।*

দেবমন্দিরে অশ্লীলতা।

(স্বামী ক্ষেমানন্দ)

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে যে অশ্লীল চিত্র আছে, কংগ্রেস পক্ষের কোন কোন সদ্বিবেচক ব্যক্তি উহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি ও প্রতিবাদ উপস্থিত করিয়াছেন। ইহা যে কতদূর সঙ্গত কার্য্য, তাহা একমুখে বলিয়া উঠা যায় না। আমরাও একবার কয়েকটী বালক-বালিকা সঙ্গে লইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তৎপূর্ব্বে সেইস্থলে ঐ প্রকার অতীব অশ্লীল চিত্রের অস্তিত্ব আমাদের জানা ছিল না। আমি তো উহা দেখিয়া স্তম্ভিত। সুখের বিষয়, সঙ্গী বালক-বালিকাদের ঐরূপ চিত্র উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত বুদ্ধি তখনও পরিস্ফুট হয় নাই। বলা বাহুল্য, ঐ সকল চিত্র উহাদের দৃষ্টিগোচর হইবার পূর্ব্বেই আমি মন্দির হইতে উহাদিগকে ফিরাইয়া আনিলাম।

শুনিয়াছি কোন সুপ্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত প্রবীণ ব্যক্তি তাঁহার এক নাতিকে সঙ্গে লইয়া পুরীর মন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি নাকি ঐ সকল চিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নাতির নিকটে উহাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিতেছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, নাতির বয়স তখন চার কি পাঁচ বৎসর হইয়াছিল। আমরা জানি না, নাতির মনে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অথবা চিত্রগুলির অশ্লীলতা, কোনটী অধিকতর মুদ্রিত হইয়াছিল।

দেবালয়গুলি এইরূপে অশ্লীলতার কেন্দ্ররূপে দাঁড়াইয়া দেশের চতুর্দ্দিকে হলাহল বিকীর্ণ করিবার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। সংবাদপত্রে দেখিতেছি যে, পুরীর রাজা যিনি জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সংরক্ষক, ঐ সকল চিত্রগুলির উপর সামান্য একটু চূণকাম করিয়া বা পরদা ফেলিয়া দর্শকদিগের চক্ষুর অন্তরালে রাখিবার ব্যবস্থা

* প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩০৮।

করিবেন। কিন্তু আমাদের মতে ইহা লোকের মন-ভোলান একটী কথামাত্র। পুরীর রাজা একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করি যে, তিনি আর্টের দোহাই দিয়া বা অন্য কোন কিছুর দোহাই দিয়া যেন এই ভীষণ অশ্লীল চিত্রগুলির সংরক্ষণে প্রবৃত্ত না হন। ঐ সকল তীব্র বিষের উৎস ও মনুষ্যত্বের বিলোপসাধক চিত্রগুলি নির্ম্মমভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দেবমন্দিরে পবিত্রতার সুমঙ্গল বায়ু প্রবাহিত করুন। আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি, নিতান্তই অন্ধবিশ্বাসী ব্যতীত দেশবাসী সকলেই তাঁহাকে এ বিষয়ে সমর্থন করিবেন।

এই সকল চিত্র দেখিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, ভারতবর্ষ এক সময়ে অবনতির যে চরম সীমায় নামিয়া গিয়াছিল, ঐ সকল চিত্র শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহারই নীরব কিন্তু জলন্ত সাক্ষীরূপে দণ্ডায়মান। যে সকল চিত্র দেখিয়া দেশবিদেশের মানব মাত্রেরই মস্তক লজ্জায় ও ঘৃণায় অবনত হইয়া আসে, সেই সকল চিত্র দেশের ঘোর দুর্দ্দিনের সাক্ষ্য দিবার জন্য সঞ্চিত রাখিবার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না।

দেবালয়গুলিকে যে অশ্লীলতার কেন্দ্র ও উহার বিষবীজ ছড়াইবার প্রধান সহায় বলিয়া আসিলাম, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। কেবল পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির কেন, কাশীধামে নেপালী শিবালয়েও ঠিক ঐরূপ অশ্লীল চিত্রাবলীর বিচিত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয়। একদিন আমি আমার একটী অল্পবয়স্ক আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া কাশীর বিভিন্ন স্থান ও দেবমন্দির-দর্শনে বাহির হইয়া ঐ নেপালী দেবালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ঐ আত্মীয়টী যখন আমাকে ঐ সকল চিত্র দেখাইতে লাগিল, তখন আমি অন্তরে লজ্জায় ও ঘৃণায় মরিয়া যাইতে-ছিলাম। পাছে ঐ আত্মীয়টীর মনে অতিমাত্রায় কুভাব-সকল জাগিয়া উঠে, সেই কারণে আমি উপরোক্ত প্রবীণ ব্যক্তির কথা মনে করিয়া ঐ সকল চিত্রগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে লাগিলাম এবং বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে, ঐগুলি তন্ত্রোক্ত বিভিন্ন "মুদ্রার" চিত্র মাত্র। এইরূপে দুই একটি কথা বলিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া তথা হইতে চলিয়া আসিলাম।

এই সকল চিত্রের, অশ্লীলতা কথা দ্বারা, ব্যাখ্যা দ্বারা যতই কেন ঢাকিবার চেষ্টা করা হউক না, উহা কিছুতেই ঢাকা যায় না। দীর্ঘ রাত্রির পর রাত্রি অশ্লীল উপন্যাস পড়িয়া কাটাইলে তাহাদের অশ্লীল ভাব যেমন হৃদয়ে অঙ্কিত না হইয়া যায় না, সেইরূপ এই সকল চিত্রও ক্ষণেকের মধ্যে দর্শকদিগের মনে অশ্লীল ভাবসকল না অঙ্কিত করিয়া যাইতে পারে না। দেবতাদিগের উপর যদি দেবতা বলিয়া যথার্থ আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা রাখিতে চাই এবং সেই ভক্তিশ্রদ্ধা যদি স্ত্রীপুত্র-কন্যাদিগের অন্তরে জাগাইয়া তুলিতে চাই, তবে আর্টের দোহাই দিও না, প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যের কথা তুলিও না, ঐ সকল অতীব দোষাবহ অশ্লীল চিত্রসকল সমূলে নির্ম্মূল করিবার জন্য সমবেতভাবে যত্নবান ও সচেষ্ট হও। অশ্লীল ভাবের উৎস এই চিত্রগুলি নির্ম্মূল না করিলে দেশের মধ্যে পবিত্রতা আনয়ন করা এবং তদনুসঙ্গে উন্নতি ও মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত করা বড়ই দুরূহ হইবে। সমবেতভাবে এক-হৃদয়ে হিন্দুজাতি এ বিষয়ে অগ্রসর হইলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সকল আপত্তিই খণ্ডিত হইবে।

ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানগুলি যে কতবিধ পাপের উৎসে পরিণত হইয়াছে, তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। উৎকল ও দাক্ষিণাত্যের দেবালয়গুলির সংশ্লিষ্ট "দেবদাসী"র কথা কে না অবগত আছেন? মথুরা-বৃন্দাবনে "সেবাদাসী"রই বা কথা কোন্ হিন্দু না অবগত আছেন? বলা বাহুল্য যে, এই সকল দেবদাসী ও সেবা-দাসী ব্যভিচারমূলক শতবিধ পাপের স্রোত ধর্ম্মের নামে দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর বহাইয়া দিতেছে এবং তাহার ফলে দেশবাসীকে সহস্রবিধ রোগে শোকে জরাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে। আমরা যতদূর অবগত আছি তাহাতে দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, ইহার এতটুকু অতিরঞ্জিত উক্তি নহে। এই সকল দারুণ কুপ্রথা থাকিতে দেশের উন্নতি ও মঙ্গলের পথ মুক্ত করিবার আশা সুদূরপরাহত। ভিতরের এ দুর্ব্বিষহ পরাধীনতা থাকিতে, রোগে শোকে দেহমন ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকিলে বাহিরের স্বাধীনতা লাভ করিবার আশা করিবে কে? প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে গেলে আমাদের অন্তরে বাহিরে, আমাদের আহারে বিহারে, আমাদের ধ্যানে ও জ্ঞানে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা চাই—ব্রহ্মকে পাইবার অনুকূল যাহা কিছু তাহাই অন্তরে ধারণ করিতে হইবে, এবং তাহার প্রতিকূল যাহা কিছু, হৃদয়ের সমস্ত বলের সহিত তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহার ধ্বংসসাধনে দৃঢ়সংকল্প হইতে হইবে।

কোথায় পুরী, কোথায় দাক্ষিণাত্য, কোথায় বা কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, আর কোথায় বা কামাখ্যা—এই কামাখ্যাতে যাও, সেখানেও একটি অতীব লজ্জাবহ অশ্লীল প্রথা প্রচলিত আছে। শুনিয়াছি, তথায় কুমারী-পূজার নামে অতীব অশ্লীল অনুষ্ঠানসকল অনুষ্ঠিত হয়। তদ্ব্যতীত অম্বুবাচীর সময়ে যে অনুষ্ঠান প্রচলিত দেখা যায়, তাহার সবিস্তার উল্লেখ করিয়া আমার লেখনী কলঙ্কিত করিতে চাহি না। সেই অনুষ্ঠানের সাক্ষী-স্বরূপে এক টুকরা রঞ্জিত বস্ত্র আনিয়া গৃহে রাখিলে

সমস্তই মঙ্গল হইবে, এইরূপ প্রলোভন ও আশা পাইবার কারণে যাত্রীগণ অম্লানবদনে সেই লজ্জাকর প্রথা সহ্য করেন—তাহার বিরুদ্ধে এতটুকুও আপত্তি উত্থাপন করেন না।

যতদিন দেশবাসী সত্যধর্ম্মকে অন্তরে বরণ করিয়া না লইবে এবং বিভিন্ন দেবদেবীর পূজাকে মঙ্গলসাধক মনে করিয়া অজ্ঞানের অন্ধ-কারাগারে আপনাকে আবদ্ধ রাখিবে, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ অপ্রতিম পরমাত্মার উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকিয়া আপনাকে যতদিন উন্নতি ও মঙ্গলের সুপ্রশস্ত পথে দাঁড় না করাইবে, ততদিন আমাদের শ্রেয় দেখিতে পাই না। অন্তরের পরাধীনতার দাসখত যদি আমরা পূর্ব্ব হইতেই স্বাক্ষর করিয়া দিই, তবে বাহিরের পরাধীনতার জন্য কাহাকেও অপরাধী সাব্যস্ত করা আমাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে না।

শাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব।*

(স্বামী ভূমানন্দ)

শাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, নির্ব্বিবাদে একই গ্রন্থে পরস্পর-বিরোধী মতবাদ-সকল স্থান লাভ করায় একদিকে যেমন ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে, অপর দিকে 'নানা মুনির নানা মতের' সহিত পরিচিত হইয়া হিন্দু জাতির নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরও হ্রাস হইয়াছে। যে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হইতে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয় হইতে শ্রদ্ধা জাগ্রত হইয়া মানবকে মিথ্যার বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইবার প্রেরণা প্রদান করিয়া থাকে, সেই শ্রদ্ধা হারাইয়াছে বলিয়াই হিন্দু জাতির দুর্দ্দিনের অবসান কিছুতেই হইতে পারিতেছে না। হিন্দু জাতির নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি যাহাতে জাগ্রত হয় তৎজন্য এই প্রবন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সৃষ্টিবর্ণনা উদ্ধৃত করা হইল।

এই সকল সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে কোন্ মত সত্য ও কোন্ মত অসত্য তাহা পাঠকগণের সুবিচারের উপর নির্ভর করিবার জন্য উপনিষদসকলের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্বের অনৈক্য দর্শন করিয়া আচার্য্য শঙ্কর যে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। "নির্গুণ নিষ্ক্রিয় দ্বৈতহীন সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ও জড় প্রকৃতির সহযোগে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অপর দিকে পঞ্চ তন্মাত্রা ও পঞ্চ মহাভূত, দশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূল ভূতের যোগে জীবজগতের উদ্ভব।" এই কষ্টি-পাথর পাঠকগণের হস্তে অর্পণ করিয়া আমরা প্রথমে হরিবংশের সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। পাঠকগণ বিচার করিয়া স্থির করুন, ইহার মধ্যে কোন্ মত সত্য ও কোন্ মতই বা মিথ্যা।

হরিবংশে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা :—

(ক) * * * মহতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূতসমূহ জন্মিয়াছে। আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূত হইতে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ স্থূল ভূত আবির্ভূত হইয়াছে। [প্রথম অধ্যায়]

(খ) অনন্তর ঈশ্বর অগ্রে বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, অবক্র, ইন্দ্রধনু, খেচরসমুদয় ও পর্য্যন্যের সৃষ্টি করিলেন এবং যজ্ঞসিদ্ধির নিমিত্ত ঋক, যজু ও সামবেদের আবিষ্কার করিলেন। মুখ হইতে দেবগণ, বক্ষ হইতে পিতৃগণ উৎপাদন করিলেন, উপস্থেন্দ্রিয় হইতে মনুষ্যগণ, জঘন হইতে অসুরগণ এবং সাধ্য দেবগণের উদ্ভব হইল। [প্রথম অধ্যায়]।

(গ) * * তিনি আত্মদেহকে দ্বিধা করিয়া একাংশে পুরুষ ও অপরাংশে নারী হইলেন, সেই নারীতে তিনি বিবিধ প্রজা সৃজন করিলেন। [প্রথম অধ্যায়]

হরিবংশের প্রথম অধ্যায়ের যে তিনরকম সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্ধৃত হইল, ইহার এক মতের সহিত অপরাপর মতের কোন ঐক্য দৃষ্ট হইবে না। এবং উক্ত তিন মতের কোন মতই বলেন নাই যে, ব্রহ্মার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের উদ্ভব হইয়াছে।

কিন্তু এই 'হরিবংশে' অন্যত্র লেখা আছে—

(ঘ) ক্ষত্রিয় গৃৎসমদের পুত্র শুনক, তাহার পুত্র শৌনক নিজ সন্তানগণকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

[ঊনবিংশ অধ্যায়]

(ঙ) ব্রহ্মা—দক্ষ, মরীচি, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, গৌতম, ভৃগু ও অঙ্গিরা এই দশ পুত্র সৃজন করিলেন। [ষন্নবত্যধিকশততম অধ্যায়।]

(চ) * * শুদ্ধ ব্রহ্মই জীবরূপে সংসারে বিচরণ করেন। * * বিপ্রগণ একমাত্র পরব্রহ্মকে বহু-প্রকার বলিয়া থাকেন। * * বিধাতা স্বয়ংই স্ত্রী ও পুরুষ বিগ্রহ ধারণ করিলেন।

[নবনবত্যধিক শততম অধ্যায়]

বাহুল্যভয়ে অন্য মত সকল আর উদ্ধৃত করা হইল না। এখন পাঠকের কর্ত্তব্য আচার্য্য শঙ্করের মীমাংসারূপ সৃষ্টিতত্ত্বের কষ্টিপাথরে উপরোক্ত মতসকল যাচাই করিয়া দেখা। তার পর যে মত সত্য বলিয়া ধার্য্য হইবে, তাহা গ্রহণ করিয়া অপর মিথ্যা মতগুলিকে পরিত্যাগ করা।

* মতামতের জন্য লেখক দায়ী। তঃ সঃ

এতদিন মিথ্যা মতবাদকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া হিন্দু হিন্দুর প্রতি যে অবিচার করিয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্তও সঙ্গে সঙ্গে করিতে হইবে। এবং মনে রাখিতে হইবে,—এ দুর্দ্দিনে 'হিন্দুকে হিন্দু রক্ষা না করিলে কে করিবে?'

বিষ্ণুপুরাণে—সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা :—

(ক) "হে মৈত্রেয়! সনাতন বিষ্ণু এই প্রকাণ্ড জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা। তিনিই সর্ব্বভূতে আত্মরূপে বিরাজমান আছেন। তিনি পরমাত্মাস্বরূপ। তিনি অজ, অক্ষয়, অব্যয় নিত্য পরব্রহ্ম। সৃষ্টির পূর্ব্বে অতীত প্রলয়কালে দিবস বা রাত্রি, আকাশ বা ভূমি, কিম্বা অন্য কোন পদার্থই ছিল না। তৎকালে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির অগোচর প্রকৃতি ও পুরুষ ও ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। নিরুপাধি বিষ্ণুর প্রকৃতি ও পুরুষের ন্যায় কাল নামে আর একটা রূপ আছে। প্রকৃতি ও পুরুষ ঐ কালের সহিত সৃষ্টিকালে যোজিত ও প্রলয়কালে বিয়োজিত হন। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়প্রবাহের আদি বা অন্ত নাই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাপন্ন মহা-প্রলয়কালে প্রকৃতি ও পুরুষ পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিতি করেন। অনন্তর সৃষ্টির সময় উপস্থিত হইলে পরব্রহ্ম স্বীয় ইচ্ছানুসারে জগতের উপাদন-কারণ-স্বরূপ প্রকৃতিতে ও নিমিত্ত-কারণ-স্বরূপ পুরুষে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সৃষ্টিকে উন্মুখ করিয়াছেন। প্রথমে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন প্রকার মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে যথাক্রমে বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি এই ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। ভূতাদি ও তামস অহঙ্কার হইতে শব্দ, শব্দ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে রূপ, রূপ হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে রস, রস হইতে জল, জল হইতে গন্ধ এবং গন্ধ হইতে পদার্থ সৃষ্ট হইল।"

[দ্বিতীয় অধ্যায়]

(খ) "প্রলয়কালে নীর অর্থাৎ জল বিষ্ণুর অয়ন অর্থাৎ বাসস্থান হয়, এই জন্য বিষ্ণুর নাম নারায়ণ। এই বরাহকল্পে ভগবান্ বরাহরূপ অবলম্বন করিয়া জলমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। পঞ্চম অধ্যায়, —ব্রহ্মা হইতে প্রথমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র উৎপন্ন হইল। পরে তিনি বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদগণের এবং পশুপক্ষ্যাদি তির্য্যগ্ জাতির সৃষ্টি করিয়া সত্ত্বগুণপ্রধান ঊর্দ্ধস্রোত দেবগণকে সৃজন করিলেন। তৎপরে তিনি অর্ব্বাক্‌স্রোত মনুষ্যগণের সৃষ্টি করিলেন। মনুষ্যেরা রজঃ ও তমোগুণের আধিক্যনিবন্ধন সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠানে অনুরক্ত ও সাতিশয় দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা কুমারগণের (সনকাদির) সৃষ্টি করিলেন।"

"পরে ব্রহ্মার দেহ হইতে অসুরগণের উৎপত্তি হয়। তৎপরে তিনি ঘোরদর্শন শ্মশ্রুধারী ক্ষুধাতুর প্রাণিগণের সৃষ্টি করিলেন। তাহারা সৃষ্ট হইবামাত্র ক্ষুধায় কাতর হইয়া ব্রহ্মাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইল। তাহারা রক্ষ, এবং যাহারা ভক্ষণ করিতে স্বীকৃত হইল, তাহারা যক্ষ নামে অভিহিত হইল। উহাদের বিকটাকার অবলোকনে তিনি অত্যন্ত ক্রোধাসক্ত হওয়াতে তাঁহার কেশপাশ বিশীর্ণ ও ভূতলে নিপতিত হইয়া সর্পরূপে পরিণত হইল। ব্রহ্মার মস্তক হইতে কেশ সর্পিত অর্থাৎ বিগলিত হওয়াতে সর্প, এবং তাহা একেবারে মস্তক হইতে লীন হইল না বলিয়া, অহি নামে অভিহিত হইয়াছে। তিনি কোপযুক্ত ক্রোধনস্বভাব ঘোরদর্শন কপিলবর্ণ মাংসাশী পিশাচগণের সৃষ্টি করিয়া গন্ধর্ব্বগণের সৃষ্ট করেন। গো অর্থাৎ গীত (বাক্যামৃত) অধন অর্থাৎ পান করিতে করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া, তাহারা গন্ধর্ব্ব নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মার বক্ষস্থল হইতে মেষ, মুখ হইতে ছাগ, উদর ও পার্শ্ব হইতে গো, পদদ্বয় হইতে অশ্ব * * কৃষ্ণসার প্রভৃতি পশুজাতি এবং রোম হইতে ফল, মূল ও ঔষধিসমূহ উৎপন্ন হইল।" [চতুর্থ অধ্যায়]

(গ) "ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে বৈশ্য এবং পাদদেশ হইতে শূদ্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল। এই চারি বর্ণই যজ্ঞাধিকারী। যজ্ঞ সম্পাদনার্থই ইহারা সৃষ্ট হইয়াছেন।" [ষষ্ঠ অধ্যায়]

(ঘ) "ক্ষত্রিয় গৃৎসমদের পৌত্র শৌনক নিজ পুত্রগণকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত করিয়াছিলেন। শৌনক চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রবর্ত্তক "

[বিষ্ণুপুরাণ, ১।৮ অধ্যায়]

মন্তব্য অনাবশ্যক। বিচারের কষ্টিপাথরে যা'ই করিতে পারিলেই যাহা কিছু সত্য-মিথ্যা আছে, তাহা নিশ্চিত ধরা পড়িবে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে সৃষ্টিতত্ত্ববর্ণনা :—

জৈমিনি প্রশ্ন করিলেন,—"কি প্রকারে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টি হইল? * * কি প্রকারে দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ এবং ভূতাদির উৎপত্তি হয় * * ? ইত্যাদি। উত্তরে সৃষ্টির দার্শনিক তত্ত্ব আলোচিত হইবার পরে মার্কণ্ডেয় কহিলেন, "এই নানা বীর্য্যবান সাতটি পদার্থ যৎকালে পৃথক্‌ভাবে থাকে তৎকালে প্রজাসৃজনে সমর্থ হয় না। ইহারা যৎকালে পরস্পর মিলিয়া পরস্পরকে অবলম্বনপূর্ব্বক সম্যক্ প্রকারে

একতা প্রাপ্ত হয় এবং যৎকালে পুরুষের অধিষ্ঠান ও প্রকৃতির অনুগ্রহ লাভ করে, তৎকালে মহৎ হইতে বিশেষ পর্য্যন্ত ঐ সকলে অণ্ড সমুৎপাদন করে। ঐ অণ্ড জলবিম্বের ন্যায় জলে আশ্রয় পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হইতে থাকে। মহামতে! সলিলস্থ ঐ অণ্ড ভূতগণ হইতে বৃহৎ। ব্রহ্মা বিধেয় ক্ষেত্রজ্ঞও সেই প্রাকৃত অণ্ডে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। তিনিই প্রথম-শরীরী এবং পুরুষ বলিয়া অভিহিত হন। তিনিই ভূতসমূহের আদি-কর্ত্তা ব্রহ্মা। তিনিই এই সকলের অগ্রে বিরাজিত হইয়া থাকেন। * * সুরাসুর-মানুষপূর্ণ অখিল জগৎ সেই অণ্ডে প্রতিষ্ঠিত। * * এই প্রকৃতিই ক্ষেত্র ও ব্রহ্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ নামে কথিত। * * এই প্রকারেই ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিত প্রাকৃত সৃষ্টি অবুদ্ধি সহকারে প্রথমে বিদ্যুল্লতার ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছে॥"

[পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়—৫৯—৭৩ শ্লোক]।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন—* * "দেবযোনি অষ্টবিধ সৃষ্টি করিয়া স্বদেহ হইতে অন্য পশুপক্ষী সকল উৎপন্ন করিলেন। মুখ হইতে ছাগ, বক্ষ হইতে পক্ষী, উদর ও পার্শ্বদেশ হইতে গো * * প্রাদুর্ভূত হইয়াছে " *; অতঃপর স্থাবর, জঙ্গম, ভূতগণ, যক্ষ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব অপ্সরগণ কিন্নর ইত্যাদি যাবতীয় শরীরী ও অশরীরী পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে॥"

[অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ২৫-৩০ শ্লোক]।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—* * "পিশাচ, উরগ, রাক্ষস * * মানুষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি সরীসৃপ * * অণ্ডজ প্রাণীগণ অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে॥"

[উনপঞ্চাশৎ অধ্যায়—১৬ শ্লোক]।

"অনন্তর প্রভু ব্রহ্মা সেই পূর্ব্বসৃষ্ট আত্মসদৃশ পুরুষকে স্বায়ম্ভুব মনু নাম দিয়া প্রজাপালক করিলেন। আর তপস্যা দ্বারা বিধুতপাপা সেই কামিনীকে শতরূপা নাম প্রদান করিলেন। সেই পুরুষ (মনু) হইতে শতরূপার দুইটি পুত্র হইল,—নাম প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। ইঁহারা উভয়েই স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদ্বারা প্রসিদ্ধ॥"

[পঞ্চাশৎ অধ্যায় ১০—১৫ শ্লোক]।

পুরুষসূক্তের আলোচনায় দেখা যায় যে, খণ্ডিত পুরুষের মুখ প্রথমে ব্রাহ্মণ হইল; তার পরের সূক্তেই সেই মুখ হইতে, ইন্দ্র ও অগ্নি উৎপন্ন হইল। বৃহদারণ্যকোপনিষদে প্রজাপতির মুখ হইতে অগ্নির উদ্ভব হইয়াছে। মহাভারতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু বিষ্ণু ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের মৌলিক উপলব্ধির ফলে লিখিত আছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ছাগ ও পার্শ্ব হইতে গো উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা :—

ব্রহ্মপুরাণের প্রথম অধ্যায়ে যত রকম সৃষ্টিতত্ত্ব রহিয়াছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল :—(ক) ব্রহ্মাকেই সর্ব্বভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। মহৎ হইতে অহঙ্কারের উদ্ভব, সেই অহঙ্কার হইতেই ভূতসমূহের আবির্ভাব। সেই সকল ভূতসমূহ হইতে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন ভূতজাতির উৎপত্তি। এইরূপে সনাতন সৃষ্টি-প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে।

(খ) সেই ব্রহ্মা হইতে মহাতেজা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ এই সপ্ত মানস-পুত্র আবির্ভূত হইলেন। * * এই সাতজন মানস-পুত্র হইতে প্রজাগণ (মনুষ্য) ও রুদ্রগণ জন্মগ্রহণ করেন।

(গ) প্রজাপতি যখন দেখিলেন,—সৃষ্টি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না, তখন আত্মদেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধে পুরুষ ও অপর অর্দ্ধে নারী হইয়া নানাবিধ প্রজা সৃষ্টি করেন।

প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টি সম্বন্ধে যে তিন মত রহিয়াছে, তন্মধ্যে ব্রহ্মার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের উদ্ভবের কথা উক্ত হয় নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম সৃষ্ট মানুষ মনু হইতে যে তিন পুত্র জন্মিয়াছিল, বংশপরিচয়ে তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে।

এই গ্রন্থের মধ্যে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় সাংখ্যমতই বহুস্থলে কথিত হইয়াছে। তবুও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের নাম ও জাতিধর্ম্ম এই গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে। কিন্তু বংশগত জাতিবিভাগ যে এই গ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত নহে, উদ্ধৃত বচন হইতেই তাহা পরিস্ফুট হইবে।

ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়ের আরম্ভে প্রশ্ন হইয়াছে, শূদ্র কোন্ কর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং ব্রাহ্মণই বা কোন্ কোন্ কর্ম্মের ফলে শূদ্রত্ব লাভ করে?

এই প্রশ্নের উত্তরে উক্ত আছে,—* * "শুভকর্ম্ম সকল আচরণ করিলে শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে।" অন্যত্র আছে,—"নীচকুলোদ্ভব শূদ্রও যথাবিধি সংস্কারযুক্ত আগম জ্ঞানসম্পন্ন হইলে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। অসদ্বৃত্ত, বিবিধ সঙ্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণও স্বীয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব লাভ করে।" পরে লেখা আছে,—"ব্রাহ্মণত্বলাভের প্রতি বংশসংস্কার, শ্রুতিজ্ঞান, সন্তুতচিন্তা এই সকল কিছুই কারণ নহে, একমাত্র চরিত্রই উহার কারণ। জগতে যত ব্রাহ্মণ দেখা যায়, সদাচারই তাহাদিগের ব্রাহ্মণ্যের হেতু। সদাচারে অবস্থিত শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে।" অধ্যায়ের উপসংহারে আছে,—"শূদ্র যে প্রকারে দ্বিজ হইতে পারে, আর ব্রাহ্মণ যেরূপে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই গুহ্য বিষয় তোমাকে কহিলাম।"

প্রশ্ন হইতে পারে,—এমন পরস্পরবিরোধী সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা কেমন করিয়া একই গ্রন্থ মধ্যে স্থানলাভ করিল?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে,—(ক) প্রত্যেক ধর্ম্মগ্রন্থের নিজস্ব একটি করিয়া সৃষ্টিবর্ণনা ছিল।

(খ) পরে সেই গ্রন্থে বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিশেষ বিশেষ বর্ণনা যুক্ত করা হইয়াছে।

(গ) যাঁহারা যখন এইভাবে নূতন নূতন বিধিসকল যুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা তখন পূর্ব্বজ শাস্ত্রকারগণের মর্য্যাদারক্ষার জন্য পূর্ব্বের কোন বিধান উচ্ছেদ না করিয়া নূতন নূতন মতসকল যুক্ত করিয়া গিয়াছেন বলিয়াই এমন পরস্পরবিরোধী বিধানসকল একই গ্রন্থমধ্যে স্থানলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

এই হিসাবে মনুসংহিতাও যে একহাতে রচিত নহে, অতঃপর মনুসংহিতার আলোচনা হইতে তাহাও সম্যক প্রকাশ পাইবে :—

মনুসংহিতার সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা :—

১। প্রলয়কালে এই জগৎ এই প্রকারে প্রকৃতিতে লীন ছিল যে, উহা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই ত্রিবিধ প্রমাণের বিষয় ছিল না ॥ ১।৫ ॥

২। প্রলয়ান্তর বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর, স্বেচ্ছায় দেহধারী, সৃষ্টিকার্য্যে অমিতসামর্থ্যশালী ও প্রলয়-বিনাশক পরমাত্মা প্রলয়কালে সূক্ষ্মরূপে প্রকৃতিতে লীন আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত ও মহদাদি তত্ত্ব স্থূলরূপে বিকাশ করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইলেন ॥১।৬॥

যিনি সকল লোক, বেদ, পুরাণ, ইতিহাসাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, যিনি মনোমাত্র-গ্রাহ্য, অবয়বহীন, নিত্য ও সকল ভূতের অন্তরাত্মা হয়েন, এবং যাঁহার ইয়ত্তা করা যায় না, তিনি স্বয়ংই মহদহঙ্কারাদি কার্য্যরূপে প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥১।৭॥

সেই পরমাত্মা প্রকৃতিরূপে পরিণত আপন শরীর হইতে নানাপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে, কিরূপে সৃষ্টি সম্পাদন হইবে, এই সঙ্কল্প করিয়া প্রথমতঃ 'জল হউক' বলিয়া আকাশাদি ক্রমে জলের সৃষ্টি করিলেন ও তাহাতে আপন শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করিলেন ॥১।৮॥

অর্পিত বীজ সুবর্ণনির্ম্মিতের ন্যায় সূর্য্যসদৃশ প্রভাযুক্ত একটী অণ্ড হইল। ঐ অণ্ডে সকল লোকের জনক স্বয়ং ব্রহ্মাই শরীর পরিগ্রহ করিলেন ॥১।৯।

নরনামক পরমেশ্বরের দেহ হইতে জলের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া উহাকে নার বলা যায়; যেহেতু ঐ জলসকল প্রলয়কালে পরমাত্মার অয়ন অর্থাৎ স্থান হয়, এইজন্য পরমাত্মা নারায়ণ শব্দে কথিত হইয়াছেন ॥১।১০॥

যে পরমাত্মা সৃষ্ট বস্তুমাত্রেরই কারণ, যিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, যাঁহার ক্ষয়োদয় নাই, যিনি তৎপদের প্রতিপাদ্য, এবং যিনি প্রত্যক্ষের বিষয় নহেন বলিয়া অসৎশব্দেও কথিত হইয়াছেন, সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন এই অণ্ডজাত পুরুষ লোকে ব্রহ্মা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন ॥১।১১॥

ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অণ্ডে ব্রাহ্ম পরিমাণে এক বৎসর কাল বাস করিয়া, অণ্ড দ্বিধা হউক মনে হইবা-মাত্র স্বয়ং সেই অণ্ডকে দুই খণ্ড করিলেন ॥১।১২॥

তিনি সেই দুই খণ্ডের উর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গ ও অপর খণ্ডে পৃথিবী করিলেন, এবং মধ্যভাগে আকাশ, অষ্ট দিক্ ও চিরস্থায়ী সমুদ্র নামক জলাধার প্রস্তুত করিলেন ॥১।১৩॥

ব্রহ্মা পরমাত্মা হইতে পরমাত্মার স্বরূপ হইয়া মনের সৃষ্টি করিলেন, যে মন এক এক সময়ে এক এক প্রকার জ্ঞানের আধার বলিয়া সৎস্বরূপ, ও প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া অসৎস্বভাব। মনের সৃষ্টির পূর্ব্বে অভিমানের জনক ও স্বকার্য্যসাধনক্ষম অহং অর্থাৎ আমিত্ব-বোধক অহঙ্কারতত্ত্বেরও সৃষ্টি করিলেন ॥১।১৪॥

ব্রহ্মা অহঙ্কারতত্ত্বের সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমেশ্বর হইতে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি করিলেন, যে মহত্তত্ত্ব আত্মা হইতে উৎপন্ন আত্মশব্দে কথিত হইয়াছে। আর সত্ত্বরজস্তমোগুণযুক্ত অন্য পদার্থসকল সৃষ্টি করিলেন, এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের গ্রাহক শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্, পাদ, হস্ত, গুহ্য, উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি করিলেন ॥১।১৫॥

অসীম কার্য্যনির্ম্মাণে সমর্থ অহঙ্কার ও তন্মাত্র-পদ-বাচ্য পঞ্চভূত। অহঙ্কারের বিকার ইন্দ্রিয়, তন্মাত্রের বিকার পঞ্চ মহাভূত, তাহাতে তন্মাত্র ও অহঙ্কারের যোজনা করিয়া, মনুষ্য পশু পক্ষী স্থাবর প্রভৃতি সমুদয় ভূতের সৃষ্টি করিলেন ॥১।১৬॥

(এই সৃষ্টির ফলে সমান প্রসবাত্মিকা-জাতিই সৃষ্ট হইল।)

সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর ভূলোকাদি প্রজাবৃদ্ধি করিবার মানসে আপন মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলেন, অর্থাৎ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্রের সৃষ্টি করিলেন ॥১।৩১॥

যদিও দর্শনের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া উক্ত বিধানের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে গেলে ব্রহ্মার মুখাদি হইতে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের উদ্ভব একেবারেই মূল্যহীন হইয়া পড়ে; তবুও তর্কস্থলে এই মতকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও এক পুরুষ হইতে উদ্ভূত চারি পুত্র সমান জাতি ও জ্ঞাতিই হইবে। সুতরাং এই রূপক বা পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের বিধানে যে জাতিবিভাগ, তাহাতে একের অন্ন অপরে খাইলে তাহার জাতি যাইবে কিম্বা একের কন্যা অপরে বিবাহ করিলে সেই বিবাহের সন্তান অন্ত্যজ আখ্যা লাভ করিতে পারে, এমন কোন হেতু কিন্তু সংহিতায় দৃষ্ট হইবে না।

সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বর আপন শরীরকে দুই খণ্ড করিয়া অর্দ্ধাংশে পুরুষ ও অর্দ্ধাংশে নারী হইলেন। ঐ উভয়ের পরস্পরসংযোগে বিরাট্ নামক পুরুষ উৎপন্ন হইল ॥১।৩২॥

হে দ্বিজসত্তম! সেই বিরাট পুরুষ বহুকাল তপস্যা করিয়া যাহাকে সৃষ্টি করিলেন, আমি সেই মনু, আমাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অবগত হও ॥১।৩৩॥

অনন্তর আমি প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে বহু-কাল অতি কঠোর তপস্যা করিয়া প্রথমতঃ প্রজাসৃজনে সমর্থ দশজন প্রজাপতির সৃষ্টি করিলাম ॥১।৩৪॥

আমি মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশজন প্রজাপতির সৃষ্টি করিলাম ॥ ১।৩৫ ॥

এই মরীচ্যাদি দশ প্রজাপতি মহাতেজস্বী অপর সপ্ত মনুর সৃষ্টি করিলেন এবং যে দেবতাদিগকে ব্রহ্মা পূর্ব্বে সৃষ্টি করেন নাই, এমন দেবতা ও দেবতাদিগের বাসস্থান এবং কতিপয় মহর্ষির সৃষ্টি করিলেন ॥১।৩৬॥

ইহাঁরা যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, অসুর অজগরাদি নাগ ও সর্প, গরুড়াদি পক্ষিগণ আজ্যপাদি নামক পিতৃগণকে পৃথক পৃথকরূপে সৃষ্টি করিলেন ॥১।৩৭॥

ইহাঁরা বিদ্যুৎ, বজ্র, মেঘ, বক্র ইন্দ্রধনু ও সরলাকার ইন্দ্রধনু, ভূগর্ভ হইতে উত্থিত ভীষণধ্বনি, ধূমকেতু, ধ্রুব, ও অগস্ত্যাদি নানা প্রকার জ্যোতিও সৃষ্টি করিলেন ॥১।৩৮

কিন্নর, বানর, মৎস্য, নানা প্রকার পক্ষী, গবাদি পশু, নানাপ্রকার মৃগ, মনুষ্য ও একপংক্তি দন্তবিশিষ্ট অশ্বাদি জন্তু এবং সিংহাদি জন্তুসকল সৃষ্টি করিলেন ॥১।৩৯

পাঠক, যদি গীতার কথা ভুলিয়া না থাকেন তবে দেখিবেন, ভগবান বলিতেছেন,—পূর্ব্বে সপ্ত মহর্ষি ও চারিজন মনু আমার মনোভাব হইতে উৎপন্ন হইল।

মনু বলিতেছেন,—'আমি মরীচি প্রভৃতি দশজন প্রজাপতি সৃষ্টি করিলাম। ঐ সকল প্রজাপতি হইতে সাতজন মনু উৎপন্ন হইল।'

মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে আছে,—ব্রহ্মার পৌত্র স্বায়ম্ভুব মনুর বংশে সৃষ্টি কার্য্যে পরম কুশল ছয়জন মনু উৎপন্ন হয় ॥৬১॥

সেই মনুগণ স্বারোচিষ, ঔত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বিবস্বৎ-সুত এই নামে বিখ্যাত ॥৬২॥

মনুসংহিতার এই পরিচয়ের পূর্ব্বে অপর একটি পরিচয় রহিয়াছে তাহা এই:—সেই বিরাট পুরুষ বহুকাল তপস্যা করিয়া যাহাকে সৃজন করিয়াছিলেন, হে মহর্ষিগণ, আমাকেই সৃষ্ট সন্তান সৃষ্টির কারণ মনু বলিয়া জ্ঞাত হও ॥৩৩॥

আমি প্রজাসৃষ্টি অভিলাষে দুশ্চরণীয় কঠোর তপস্যা করিয়া প্রথমতঃ দশজন প্রজাপতি সৃষ্টি করিয়াছি ॥৩৪॥ মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ এই দশজন স্ব-স্ব নামনির্দ্দিষ্ট প্রজাপতি ॥৩৫॥

একই গ্রন্থে এই প্রকার অভিনব মতবাদ থাকা সত্ত্বেও স্বাধ্যায়ীগণ কেন যে এতৎসম্বন্ধে কিছু বলেন না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। এই সকল স্মৃতিশাস্ত্র যাঁহারা পাঠ করেন, তাঁহারাই বা কেমন করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে ইহা পাঠ করেন এবং সময়ে সময়ে এই সকল গ্রন্থেরই গৌরবই বা কেমন করিয়া ঘোষণা করেন? আশ্চর্য্য!

পরমাত্মা পূর্ব্বোক্ত স্বীয় অহোরাত্রের অবসানে প্রতিবুদ্ধ হয়েন এবং প্রতিবুদ্ধ হইয়াই ভূলোকাদি সৃষ্টি করিবার জন্য মনকে নিয়োগ করেন। ব্রহ্মার এইপ্রকার নিয়োগের নাম মনঃসৃষ্টি ॥১।৭৪॥

পরমাত্মা সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলে পর সেই ইচ্ছায় প্রেরিত মহত্তত্ত্ব হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়। মন্বাদি আকাশের গুণ শব্দ বলিয়াছেন ॥৭৫॥

বিকৃতভাবাপন্ন আকাশ হইতে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধবহ প্রবল পবিত্র বায়ু সমুদিত হয়। মন্বাদি উহার স্পর্শগুণ বলিয়াছেন ॥১।৭৬॥

বিকৃতভাবাপন্ন বায়ু হইতে তমোনাশক, সকল বস্তুর প্রকাশক, দীপ্তিমান্ তেজ উৎপন্ন হয়; ঐ তেজের গুণ রূপ ॥১।৭৭॥

তেজ বিকৃতভাবাপন্ন হইলে বিকারজনক তেজ হইতে জল জন্মে, জলের গুণ রস। জল হইতে গন্ধগুণসম্পন্না পৃথিবী উৎপন্ন হয়, মহাপ্রলয়াবসানে সৃষ্টির প্রথমে পঞ্চভূতের উৎপত্তিক্রম এইরূপ ॥১।৭৮॥

গ্রন্থপরিচয়।

RIGHT RESOLUTIONS.

BY

SWAMI PARAMANANDA.

Vedanta Centre, 32 Fenway, Boston, Mass,

Ananda Ashrama, LaCrescenta, California.

This *Brochure* is by Swami Paramananda of American fame. As an erudite scholar and a deep religious thinker the name of Swami Paramananda has travelled beyond the confines of his country. The Swami is as well-known in the East as in the West, and is a striking figure in American literary and religious circles. He is already the author of more than a score of religious works ranging over a variety of topics such as *Vedantic* Idealism, *Yoga* and Christian Mysticism &c &c. He is at once at home in both occidental and oriental systems of philosophy &c. &c, therefore, well-fitted to be an ideal interpreter of Easterm thought to Western minds. We must congratulate him on his latest contribution to the spiritual literature of the world. We must judge a work of this kind on its merits, not by its bulk or size. "Right Resolutions" is a small *Brochure* indeed but it is worth its weight in gold. A perusal of this booklet is sure to do one good.

If one is tempted to utter a falsehood he should, says the author, guard his tougue and repent to himself—

Truth is mightier than untruth,
Truth is my strength,
Truth is my safeguard,
Truth is ever triumphant,
I am armed with truth.

We can safely recommend the book to the public.

সংবাদ।

রবীন্দ্রজয়ন্তী।—পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের সপ্ততি বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে গত বড়দিনের অবকাশে কলিকাতায় এক সপ্তাহ ধরিয়া মহা সমারোহে জয়ন্তী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ইহার বিভিন্নমুখী অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ ইতিপূর্ব্বে নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে; এখানে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। পর পর গান্ধী-রবীন্দ্র-মালব্যজয়ন্তীঅনুষ্ঠান হেতু ইহা অনুমিত হয় যে, দেশবাসী আজ মহৎপূজায় উদ্গ্রীব হইয়াছে। ইহা অতি শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

গার্হস্থ্য সংবাদ।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ—গত ১০ই পৌষ শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় ৺যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ তদীয় মধ্যম পুত্র শ্রীমান লোকেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক তাঁহাদের শিবপুরের বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১১ই পৌষ রবিবার পূর্ব্বাহ্ন সার্দ্ধ দশ ঘটিকায় পূজনীয়া ৺নীপময়ী দেবীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ তদীয় মধ্যম পুত্র আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার যোড়াসাঁকোর বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গত ২৪শে পৌষ শনিবার পূর্ব্বাহ্ন সার্দ্ধ ৯ ঘটিকায় পূজ্যপাদ ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার বালিগঞ্জের বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীইন্দিরা দেবী কয়েকটী সঙ্গীত করিয়া সভার গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

চতুর্থাহ শ্রাদ্ধ—গত ২৭শে পৌষ মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ন ১০॥০ ঘটিকায় ৺অনিলনাথ মুখোপাধ্যায়ের চতুর্থাহ শ্রাদ্ধ তদীয় ভাগিনেয় শ্রীমান্ সুদীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক তাঁহার যোড়াসাঁকোর বাসভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

নামকরণ—গত ১৫ই পৌষ বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে সাধু ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের দৌহিত্র ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি-এইচ-ডি, বার-এট্-ল মহাশয়ের নবকুমারের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের পৌরোহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। নবকুমারের নামকরণ হইয়াছে শ্রীঋতেন্দ্রকুমার মজুমদার। ভগবান নিত্য ইহাকে আশিষ্ট দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করুন।

শোকসংবাদ।

৺অনিলনাথ মুখোপাধ্যায়।—গত ২৪শে পৌষ শনিবার রাত্রে পূজ্যপাদ ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৈবাহিক-পুত্র অনিলনাথ মুখোপাধ্যায় স্বীয় ইটালীস্থ বাসভবনে রক্তের চাপবৃদ্ধি-পীড়ায় অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। আমরা ইঁহার শোকার্ত্ত আত্মীয়স্বজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা উৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত দানগুলি কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত তুলসীদাস দত্ত	১৮৫২ শকের	...	২৲
„ „ „	১৮৫৩ „	...	২৲
শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র বসু	১৮৫৩ শকের	...	১৲
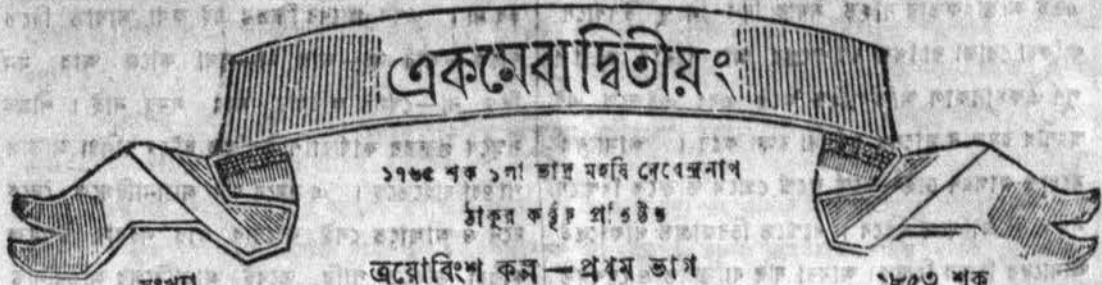
"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

মাঘোৎসব-সংখ্যা।

৮৯তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০২। সাল ১৩৩৮। শক ১৮৫৩। খৃঃ ১৯৩২। সম্বৎ ১৯৮৮। কলিগতাব্দ ৫০৩২

ওঁ তৎসৎ

স্বাগতম্

এস বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসক আমরা একত্র মিলিত হই; অন্যোন্য সাহচর্য্যে পরস্পরকে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের পথে তুলিয়া ধরি; আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মে ও অনুষ্ঠানে, প্রত্যেক ভাবে ও চিন্তায় অপ্রতিম পরব্রহ্মের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত রাখি।

স্বস্তি হউক শান্তি হউক মঙ্গল হউক

আদিব্রাহ্মসমাজ
১০২তম মাঘোৎসব
১৩৩৮ সাল।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উদ্বোধন*।

(শ্রী চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় দেশ-বিদেশের বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ মন্থন করিয়া এবং প্রচলিত ধর্ম্মের উপরে ভস্মের যে আচ্ছাদন পড়িয়াছিল, পুস্ত হইতে নানা পুস্তিকা-প্রচারে তাহা প্রতিপন্ন করিয়া এই পুণ্য মাঘের একাদশ দিবসে এই আদিব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং একেশ্বরবাদের বাণী জনসমাজের ভিতরে আরও সুস্পষ্ট-ভাবে ঘোষণা করিয়া দিলেন। তাই এই মাঘ মাস আমাদের নিকট এত প্রিয়, এত পবিত্র। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিলে কোন জাতিই আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করিতে পারে না; রাজা তাহা পূর্ণমাত্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। এক শতাব্দীর অধিক অতীত হইয়া গেল আজও আমরা রাজার এই বিরাট দানের প্রকৃত মূল্য অবধারণ করিতে পারি নাই। এখনও আমরা তাঁহার আদর্শে অন্তর্দ্দেশকে বিগঠিত করিয়া তুলিতে পারি নাই। বর্ষচক্রের বিঘূর্ণনে চান্দ্র গণনায় এই মাঘ মাসেই এবার রমজান মাসের সংক্রমণ। এই মাসে ধর্ম্মবীর হজরৎ মহম্মদ একেশ্বরবাদের বাণী আরব-দেশে প্রকাশ্যভাবে প্রথম ঘোষণা করিয়াছিলেন; তাই বুঝি এই মাস মুসলমান মাত্রেরই নিকট এত পবিত্র। এতই নিষ্ঠার সহিত,

* ৩রা মাঘ প্রাতঃকালে আদিব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।

এতই আন্তরিকতার সহিত সমস্ত দিন নিম্বু উপবাসে থাকিয়া রোজা রাখিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় তাহারা পূর্ণ একমাসকাল অতিবাহিত করে এবং এইরূপে এই স্মরণীয় রমজান মাসের মর্য্যাদা রক্ষা করে। আমাদের মধ্যেও জাগরণ চাই—ধর্ম্মে কর্ম্মে প্রেমে ভক্তিতে বিশ্বাসে সকলকে জাগিতে হইবে। ধর্ম্মেতে চিরজাগ্রত থাকাতেই আমাদের হিন্দুর হিন্দুত্ব। আমরা যদি ব্যক্তিগত ও দেশগত কল্যাণ চাই, উপনিষদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে হৃদয়ে বরণ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে বিবিধ দায়ীত্বের ভার লইয়া ধরাপৃষ্ঠে আমাদের আগমন। নিরবচ্ছিন্ন শরীরের পুষ্টিসাধনে বা অপরাবিদ্যার আলোচনায় আমাদের সেই দায়ীত্বের ভার বিমোচিত হইবে না। আমাদিগের বিবেক বুদ্ধিকে স্ফূর্ত্তিদান করিতে হইবে—জ্ঞানে ও প্রেমে ভগবানকে সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে হইবে। ঈশ্বর যে আমাদের চিরসুহৃদ চিরবন্ধু চিরনেতা—তাঁহার সিংহাসন যে কেবলমাত্র দেবালয়ে নহে কিন্তু সকল স্থানে সকল কালে সুপ্রতিষ্ঠিত, হৃদয়ের গুহাগহ্বর যে তাঁহার প্রিয় নিকেতন—একথা মুখের কথায় নহে, কেবল মতবাদে নহে, কিন্তু এই সরল ধারণা যেদিন ভিতরে আনিতে পারিবে, সেই দিন হইতে দায়ীত্ব-মোচনের অবসর ঘটিবে।

আজ উৎসবমুখে আমরা আসিয়াছি আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, হৃদয়কে প্রসারিত করিবার জন্য, সেই পরমারাধ্য পরম দেবতাকে অন্তরের ভিতরে জাগ্রত জীবন্তভাবে অনুভব করিয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাভক্তির বিমল পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিবার জন্য। আজ আমাদের মধ্য হইতে সকল দ্বন্দ্ব বিদূরিত হউক, হৃদয় সরস ও মধুময় হউক। আমাদের বাক্যে বীর্য্য অবতীর্ণ হউক, সকলের ভিতরে প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ও পিপাসা জাগ্রত হউক; এবং সেই পরম মাতার বাহুবেষ্টনের ভিতরে যে আমরা সকলে অবস্থান করিতেছি, এ চেতনা আবির্ভূত হউক, কৃতজ্ঞতাভরে মস্তক অবনত করিয়া মন্ত্রে ও সঙ্গীতে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই।

আর না—হাসিখেলা আর না।*

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

চারিদিকে যে প্রকার উত্তেজনা ও উদ্বেজনা চলিতেছে, ইহা দেখিয়া আর হাসিখেলায় মন দিতে ইচ্ছা হয় না। এখন প্রাণের ভিতর এই কথা আঘাত দিতে থাকে—আর না—আর না—বৃথা কাজে আর মন দিও না—খেলা করিবার আর সময় নাই। শীঘ্রই সম্মুখে গুরুতর কার্য্যরাশি উপস্থিত হইবে বলিয়া আভাস পাওয়া যাইতেছে। এ সময়ে যদি আপনাদিগকে দেহে মনে ও আত্মাতে সেই কার্য্যের ভার লইবার উপযুক্ত করিয়া তুলিতে পারি, তবেই আমাদিগের অভিষ্টসিদ্ধি হইবে, আমরা রক্ষা পাইব।

নির্ভয় হও। ভগবানের মাভৈঃ-ভেরীর সুমঙ্গল রবে দিদ্দিগন্ত নিনাদিত হইয়া উঠিতেছে। উৎসাহ-অনলে অন্তর প্রদীপ্ত করিয়া তোল। সত্যস্বরূপকে দৃঢ়তার সহিত অন্তরে ধারণ কর। বীরপদক্ষেপে তাঁহারই নির্দ্দেশিত সত্যের পথে চলিয়া চল—অগ্রসর হও—থামিয়া যাইও না—পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না।

নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ, নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ, বিরোধবিবাদ প্রতিজ্ঞা করিয়া পরিত্যাগ কর। বারো রাজপুত তের চুল্লী, ছত্রিশ জাতির ভেদ, ব্রাহ্মণ-পঞ্চমের অস্পৃশ্যতা—এই সকল জাতীয় অপবাদের কথা আর যেন আমাদের পরবর্ত্তী বংশধরেরা ইতিকথা ব্যতীত অন্য কোন আকারে প্রত্যক্ষ না করে। এই সকল ভেদাভেদ বিদূরিত করিয়া একবার ভারতের তেত্রিশ কোটী সন্তান মিলিত হইয়া দেশের কাজে, ভগবানের কাজে জীবন উৎসর্গ কর। দেখিতে চাই—কে আমাদিগকে প্রতিরুদ্ধ করে। প্রকৃতপক্ষে দেশের এক অংশ, মাত্র পুরুষসমাজ আজ জাগিয়া উঠিয়াছে,তাহাই প্রতিরুদ্ধ করিবার চেষ্টায় সমাজমধ্যে কি অস্থিরতা ও বিক্ষোভ প্রকাশ পাইতেছে। সমগ্র দেশের নরনারী যখন একসঙ্গে চলিবে ফিরিবে, একপ্রাণে কথা বলিবে, সে জাগরণের গতিকে প্রতিরুদ্ধ করিবার শক্তি কাহারও আছে কি না সন্দেহ।

যাঁহারা এই জাগরণের পথে অগ্রণী হইবেন, তাঁহারা অগ্রে আসুন। নিজের নাম-যশলাভের জন্য নহে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে, কিন্তু দেশের দেহ মন ও আত্মা, জাতির জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তি, সর্ব্ববিষয়ে মুক্তি প্রদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা অগ্রে আসুন—সকলের অগ্রে দেশের ও মানবসমাজের মুক্তিপতাকা বহন করিয়া চলুন। আমরাও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকিব। আমরাও পশ্চাতে পড়িয়া থাকিয়া আলস্যে মাথা রাখিয়া কাল কাটাইব না। আমরাও মুক্তির সিঙ্গা বাজাইয়া নিদ্রামগ্ন নরনারীকে জাগাইয়া তুলিব—জাগরণের ভেরীরবে গগনভুবন স্পন্দিত করিয়া তুলিব। দলে দলে মুক্তিবাহিনী প্রস্তুত করিতে থাকিব। বিশ্বপতি আমাদের সেনাপতি হইয়া সুপথ

* ৬ই মাঘ সায়ংকালে আদিব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।

দেখাইয়া চলিবেন। আমাদের গতি রুদ্ধ করে কাহার সাধ্য?

মিলনের অভাবেই আমাদের সকল কর্ম্মই পণ্ড হইয়া যাইতেছে। আমাদের মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু শত মতভেদ সত্ত্বেও আমরা বিশ্বপিতা অখিল-মাতার সন্তান, আমরা একই অমৃতপুরুষের সন্তান, এই অমৃতময় ভাব লইয়া যদি দেশের ও মানবসমাজের মঙ্গলসাধনে অগ্রসর হই, ভগবানের মঙ্গল উদ্দেশ্যসাধনে কায়মনে নিযুক্ত হই, তবে তাহা হইতে কেহই আমাদিগকে ফিরাইতে পারিবে না।

মিলনের অভাব যেমন আমাদের কর্ম্ম পণ্ড করিবার একটী প্রধান কারণ, সেইরূপ আর একটী প্রধান কারণ হইতেছে—আমাদের কথায় ও কাজে এক না হওয়া। কথায় ও কাজে আমাদের অভিন্ন হইতে হইবে। অন্তর হইতে কপটতা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিতে হইবে। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব তাহাই অন্তরে ধারণ করিতে হইবে, এবং তাহাই প্রকাশ্যে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে হইবে এবং নির্ভীক হৃদয়ে সেই সত্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। সংসারের সুখসম্পদের কথা মন হইতে দূর করিয়া দিয়া সত্যের পথে চলিতে হইবে। আমরা নিজেদের সুখসম্পদ বিনষ্ট হইবার আশঙ্কায় মুহ্যমান হইয়া পড়ি; পাছে আমাদের বিলাসের উপর এতটুকু আঘাত পড়ে, সেই বিভীষিকায় অস্থির হইয়া পড়ি। তখন সত্যের পথ আমরা ভুলিয়া যাই, আমাদের প্রকৃত শ্রেয়ের পথ আমাদের মনে থাকে না। তখন আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে বিস্তর বিভিন্নতা আসিয়া পড়ে। এই বিভিন্নতার কারণে, আমাদের জীবনে সত্য ও মিথ্যার সংগ্রামে, শ্রেয় ও প্রেয়ের সংগ্রামে আমরা প্রেয়ের পশ্চাতে ধাবিত হই, মিথ্যাকে ধরিয়া মিথ্যার উপরে সংসারকে দাঁড় করাইতে চাই। তাই না, সহসা একদিন দেখি, সেই প্রেয়, সেই মিথ্যা আমাদের শত্রুগণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আমাদিগকে আটে ঘাটে কঠোর বন্ধনে আবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। মিথ্যার সহিত কুটুম্বিতা কাটিয়া দাও। সত্যের সঙ্গে সখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হও। আলস-বিলাসকে পদতলে বিদলিত কর। প্রাণের ভয় বিদূরিত হইবে, মৃত্যুর বিভীষিকা হইতে মুক্তিলাভ করিবে। কথায় ও কাজে এক হও। তোমার সম্মুখে, কেহই অর্গলরূপে দাঁড়াইতে পারিবে না। তোমাকে কেহই বাধা দিতে অগ্রসর হইতে সাহস করিবে না। তোমার দীপ্ত নয়নের দিব্য জ্যোতিতে তোমার বিরোধী পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। বিশ্বজগত তোমার নিকটে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইবে। রাজসূয় যজ্ঞের বিশ্বজিৎ অশ্ব যেমন সমগ্র বিশ্ব জয় করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসে, তুমিও সেইরূপ বিশ্বজয়ে বাহির হইয়া বিজয়ীর বেশে দেশে ফিরিবে, ইহা সুনিশ্চিত।

ব্রহ্মোপাসনা যদি সার্থক করিতে চাও, তবে সাধু মহাপুরুষদিগের, রাজা রামমোহন রায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্রহ্মসাধকদিগের ধর্ম্মজীবনের আদর্শ নয়নের সম্মুখে রাখিয়া কথায় ও কাজে এক হওয়ার ব্রত, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া মৈত্রীসাধনের ব্রত; এবং ভগবানকে প্রীতিপূর্ব্বক সমুদয় হৃদয়-মন তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য বলিয়া দেশের ও মানবসমাজের হিতকর কার্য্যসাধনের ব্রত গ্রহণ কর; এবং একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা ঐ সকল ব্রত উদ্‌যাপন পূর্ব্বক ভগবানের চরণ-স্পর্শলাভের অধিকারী হও।

সংসারে ব্রহ্মসাধন।*

(সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণীদেবী)

১। অপ্রতিম পরব্রহ্মকে লাভ কর।

যে অপ্রতিম পরব্রহ্মের উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য আমাদের আজকার এই উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন, হে অমৃতের পুত্রগণ! উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—উত্থান কর, জাগ্রত হও এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের সন্নিধানে গিয়া সেই পরব্রহ্মের জ্ঞানলাভ কর। আজ এই মাঘোৎসবের পুণ্যপ্রভাতে ঋষিদিগের উচ্চারিত জাগরণ-মন্ত্রের দ্বারা অপ্রতিম পরমাত্মার পূজা করিবার জন্য আপনাদিগকে আমি তারস্বরে আহ্বান করিতেছি। যে নিত্য জাগ্রত মঙ্গলময় বিধাতা নিয়তই আমাদের মঙ্গলবিধান করিতেছেন এবং আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিপদআপদ হইতে নিয়তই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে মাত্র বুদ্ধিতে জানিলে চলিবে না, তাঁহাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে। শ্রদ্ধাভক্তির ভিতর দিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে হইবে।

২। সংসারে ব্রহ্মসাধন সহজ পথ।

নানা ঘটনাবিপর্য্যয়ে আমাদের দেশে এই একটি ভাব চলিয়া আসিতেছে যে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে সমস্ত সুখসম্পদ পরিত্যাগ করিতে হইবে, পিতামাতা, স্বামীস্ত্রী, পুত্র-

* ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে আদিব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।

কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া বনে জঙ্গলে গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার ভিতর যে সত্য নাই, তাহা নহে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর একটী বৃহত্তর সত্য আছে, যাহা সাধনা করিবার জন্য আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে বিশেষভাবে উপদেশ লাভ করি। সেই বৃহত্তর সত্য এই যে, যেমন দুঃখবিপদের কশাঘাতের ভিতর দিয়া ভগবানকে জানিতে হইবে, সেইরূপ সুখসম্পদের করুণারও ভিতর দিয়াও তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। অরণ্যপর্ব্বতের নীরবতার ভিতরেও যেমন তাঁহাকে আত্মা দ্বারা স্পর্শ করিবে, সেইরূপ গৃহসংসারের সজন কোলাহল-কলরবের ভিতরেও তাঁহারই করুণামূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। সংসারধর্ম্ম বজায় রাখিয়া পরমাত্মার সহিত আত্ম-সমাধানের উপরেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষ ঝোঁক দিয়া থাকেন। ভগবান যখন আমাদিগকে পিতামাতা ভাইভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনে পরিবৃত গৃহসংসার দিয়াছেন, তখন সেই গৃহসংসারের ভিতরে থাকিয়াই তাঁহাকে লাভ করা তাঁহার অভিপ্রেত ও প্রকৃতিসিদ্ধ, ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন যে, ভগবান আমাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাস যেমন সহজ করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপ গৃহসংসারে থাকিয়াও তাঁহাকে লাভ করাও প্রত্যেক মানবের অন্তরে সহজ সত্যরূপে নিহিত করিয়া দিয়াছেন; তাই এই সহজ সত্য ছাড়িয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য শ্বাপদসঙ্কুল গহন অরণ্যে প্রবেশ করিবার অথবা অযথা তর্কবিতর্কের গহন অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবার কোনই প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না।

৩। সীমাবদ্ধ হওয়াই দুঃখের কারণ।

ভগবানই একমাত্র পূর্ণস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। আমরা তাঁহা হইতে বিনিঃসৃত এক একটী সীমাবদ্ধ বিস্ফুলিঙ্গ মাত্র। সুতরাং শরতের নির্ম্মল আকাশ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে বর্ষার প্রারম্ভে যেমন মসীমর্ণ ঘনমেঘজাল সুনীল আকাশমণ্ডলকে আবৃত করিয়া ফেলে, সেইরূপ দুঃখবিপদের ঘন মেঘ-জাল যে আমাদের অন্তরকে সময়ে সময়ে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, পাপতাপের জ্বালাযন্ত্রণার অসহ্য উত্তাপে সময়ে সময়ে আমরা যে মুহ্যমান হইয়া পড়িব, তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। সীমাবদ্ধ হইবার কারণেই, আমরা পূর্ণস্বরূপ ভগবান নহি বলিয়াই, এইরূপ দুঃখবিপদ পাপতাপের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। একথা জিজ্ঞাসা করা বৃথা যে, আমরা কেন সীমাবদ্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম। এই প্রশ্নের উপর শতবিধ কূট তর্কবিতর্ক উপস্থিত করিতে পারিলেও উহার শেষ সিদ্ধান্তে মানব কোনকালে উপস্থিত হইতে পারিবে বলিয়া মনে করি না। একমাত্র ভগবানই এই প্রশ্নের শেষ পরিসমাপ্তি।

৪। মঙ্গলময় সর্ব্বদাই আমাদের নিকটে।

সংসারে দুঃখবিপদ আছে বলিয়া মঙ্গলময় বিধাতার করুণার কথা ও মঙ্গলভাব ভুলিলে চলিবে না। মাতৃ-গর্ভে অবস্থান অবধি আমরণ যাঁহার করুণা প্রতিপদে উপভোগ করিবার অবসর পাই, যাঁহার মঙ্গল হস্তের লিখন প্রতি পত্রে, প্রতি পুষ্পে, বায়ুর প্রতি হিল্লোলে, স্রোতস্বতীর প্রতি জলবিন্দুতে দৃষ্ট হয়, সময়ে সময়ে দুঃখবিপদের তাড়নায় বা পাপতাপের যন্ত্রণায় তাঁহার স্নেহময় মঙ্গলময় ভাব ভুলিলে চলিবে না। প্রত্যক্ষ কর, সমস্ত দুঃখবিপদের মধ্যে তিনি তোমার সম্মুখে পিতৃমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। তোমার দৃষ্টিকে অন্তরে ফিরাইয়া উপলব্ধি কর, সমস্ত পাপতাপ জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যে তিনি করুণাময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে অবস্থিতি করিয়া তোমার মনে প্রাণে নিত্যই শান্তিবারি সেচন করিতেছেন। ইহা স্থির জেন যে, সেই পরম পিতা-মাতা পরমেশ্বর দুঃখবিপদ পাপতাপ সমস্তই তোমার মঙ্গলসাধনেরই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। দুঃখবিপদই বল বা সুখসম্পদই বল, এসমস্তই তাঁহারই স্নেহের দান-স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে—কিছুই অবজ্ঞা বা উপে-ক্ষার বিষয় নহে। ইহা সুনিশ্চিত যে, এই বিশ্বজগত যাঁহার সৃষ্টি, তিনিই যখন তোমাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন, এই অনুপম সুন্দর জগতে তোমার আসিবার মূলকারণ যখন তিনিই, তখন তিনি কখনই তোমার প্রকৃত বিনাশের কারণ হইতে পারেন না—তিনি তোমা হইতে দূরে থাকিতে পারেন না, মুহূর্ত্তেরও জন্য তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সংসারের সকলেই যদি তোমাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি তুমি তাঁহার অনিমেষ মঙ্গলদৃষ্টি হইতে বিচ্যুত থাকিতে পারিবে না। অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে গিয়া আলোচনা কর—করিলেই দেখিতে পাইবে যে, অতীতে তুমি কতবার বিপদসাগরে ডুবিতে ডুবিতে বা পাপ-তাপের দারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হইতে কাতর প্রাণে সেই বিপদকাণ্ডারী ও পাপ-নিসূদন ভগবানকে যখনই রক্ষা করিবার জন্য ডাকিয়াছ, তখনই তিনি তোমার বিপদজাল মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া এবং তোমার পাপদগ্ধ প্রাণে শান্তিবারি সেচন করিয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। লক্ষ-কোটী যুগ-যুগান্তর ধরিয়া জগতের লক্ষ-কোটী জীব তাঁহারই আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া আনন্দসাগরে অবগাহন করিয়াছে ও করিতেছে এবং তাঁহারই জ্ঞানের ও তেজের কণামাত্র

লাভ করিয়া জগতের উন্নতি ও মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহাই তো আমাদিগকে তাঁহার পিতৃভাব ও মাতৃভাব প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে তিনি যেমন অন্নপান দিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি আজীবন তিনি আমাদিগকে তাঁহার অক্ষয় প্রেমের রক্ষাকবচে নিত্যই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী প্রেমধারায় আমাদের দেহ মন ও আত্মা হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছেন। তাঁহারই অমৃতরস পান করিয়া এবং তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তাঁহারই ইচ্ছাতে আমরা আপনার উপর নির্ভর করিতে পারিলেও তিনি কখনই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না—করিতে পারেন না।

৫। সংশয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উপাসনায় নিরত হও।

চক্ষের সম্মুখে সামান্য কুটাকাঠি আসিয়া আড়াল করিলে যেমন সমস্ত বিশ্বজগত অন্তরালে পড়িয়া যায়, সংসারের ছোটখাট ক্ষণিক সুখদুঃখকে মনের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া ঈশ্বরকে সেই প্রকার অন্তরালে ফেলিতে দিও না। সংসারের সকল কর্ম্মেই, জগতের প্রত্যেক ঘটনাতেই তাঁহার মঙ্গল হস্ত প্রত্যক্ষ কর—প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে প্রীতি কর, তাঁহার চরণে সমুদয় হৃদয়মন অর্পণ কর এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য বলিয়াই নিজের ও পরিবারের, দেশের ও জগতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলসাধক কার্য্যসমূহে আত্মনিয়োগ কর।

৬। তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনই তাঁহার উপাসনার শ্রেষ্ঠতম উপকরণ।

তাঁহার উপাসনার জন্য বাহ্যাড়ম্বরের ঘনঘটার প্রয়োজন নাই, কোন প্রকার বাহিরের উপকরণের অপেক্ষা নাই। অন্তরের একান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং তাঁহার ইচ্ছার অনুসরণে শুভকর্ম্ম সম্পাদনই তাঁহার উপাসনার শ্রেষ্ঠতম উপকরণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সত্যটী স্পষ্টতম ভাষায় সুব্যক্ত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্ররূপে সন্নিবদ্ধ করিয়া আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—তাঁহাকে প্রীতি কর ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে উপাসনার মূলতত্ত্ব এমন সংহত আকারে আর কেহ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

৭। তাঁহার রাজ্যে অমঙ্গলের স্থান নাই।

তাঁহার রাজ্যে অমঙ্গলের স্থান নাই। সমস্ত অমঙ্গলের ভিতরেই তাঁহার মঙ্গল হস্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠে। প্রতি নিমেষের প্রতি ঘটনায়, গাছের প্রতি পত্রে, কুসুমের সুগন্ধে ও আমাদের অন্তরের সদ্ভাবসমূহে এবং সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের সেই বিশ্বপতি ও বিশ্বনিয়ন্তা পরমপুরুষকে জানিবার অধিকারে তাঁহার মঙ্গলভাবের পরিচয় অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত দেখা যায়।

৮। তাঁহার রাজ্যে মৃত্যু নাই।

তাঁহার রাজ্যে মৃত্যু ও বিনাশ বলিয়া কোন কিছুই নাই। তিনি প্রাণস্বরূপ। তিনি সমস্ত প্রাণের মূলাধার। তাই আমরা কি বাহিরের প্রকৃতিরাজ্যে, কি আমাদের অন্তরের অধ্যাত্মরাজ্যে—কোথাও প্রকৃত মৃত্যু বা বিনাশ দেখিতে পাই না। বহিঃপ্রকৃতিতে যেমন মৃত্যু বা বিনাশের নামে পরিবর্ত্তনেরই চিরন্তন লীলাখেলা দেখিতে পাই—সেইরূপ আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিতেও প্রতিপদে প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর নামে পরিবর্ত্তনেরই বিচিত্র লীলার পরিচয় প্রাপ্ত হই। এই পরিবর্ত্তনসূত্রেই মানবজীবনের পশুত্ব ঘুচিয়া যায় এবং মানুষ আপনাকে দেবতার পদে উন্নীত করিতে সক্ষম হয়। জগতের ইতিহাস আমাদিগকে এই সত্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

৯। তাঁহাতে আত্মসমর্পণই রক্ষার উপায়।

ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যদি কখনও দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইতে থাকি, যদি কখনও অমঙ্গলকে ডাকিয়া আনি, যদি কখনও মৃত্যু বা বিনাশের অভিমুখে ধাবিত হই, তবে সেই দুঃখবিনাশন করুণাময় পরমেশ্বরের চরণে শরণ গ্রহণ করিলেই আমরা নিশ্চয়ই রক্ষা পাইব—আমাদের সকল দুঃখতাপ, সমুদয় জ্বালাযন্ত্রণা মুহূর্ত্তের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে এবং আমাদের অন্তরে শান্তিসুধা-শতধারে বর্ষিত হইবে। তাঁহার আদেশপালনেই আমাদের সুখ, আমাদের জীবন। তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণেই আমাদের দুঃখ, আমাদের মৃত্যু। তিনি আমাদের অন্তরে তাঁহার আদেশপালনের শুভবুদ্ধি নিয়তই প্রেরণ করিতেছেন। সেই শুভবুদ্ধির অনুশাসন অবহেলা করিবার ফলেই আমরা দুঃখ লাভ করি এবং মঙ্গলময়ের প্রতি সংশয় পোষণ করিতে থাকি। এই সংশয় দূর করিয়া দাও। ভগবানের প্রতি একান্ত নির্ভরশীল হইয়া তাঁহারই প্রেরিত শুভ-

বুদ্ধি যে পথ প্রদর্শন করিবে, সেই পথ ধরিয়া চল—কণ্টকের আঘাতে তোমাকে জীর্ণশীর্ণ হইতে হইবে না, বিষদিগ্ধ বায়ুতে তোমাকে কঙ্কালসার হইতে হইবে না। যাঁহার জ্ঞানের, যাঁহার বলের কণামাত্র লাভ করিয়া সাধু মহাত্মাগণ সংসারের দুঃখবিপদ দুরীকরণে আশ্চর্য্য বল ধারণ করেন, ইহা বলা বাহুল্য যে, সকল জ্ঞানের উৎস, সকল বলের উৎস সেই পরম পুরুষের চরণস্পর্শ লাভ করিলে তোমার দুঃখবিপদ শোকতাপ সকলই বিদূরিত হইবে। আজ এই উৎসবের পুণ্য প্রভাতে সেই আত্মদা বলদা পরমেশ্বরের চরণ-বন্দনা করিয়া এস, জীবনকে ধন্য করি।

হে মঙ্গলময় বিধাতা! হে উৎসবদেবতা! এই মহোৎসবে আমাদের মস্তকে তোমার আশীর্ব্বাদ শতধারে বর্ষণ কর, যাহাতে আমরা আমাদের শরীর মন আত্মাকে বুদ্ধি ও বলে, জ্ঞানে ও ধর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে উন্নত করিয়া তুলিতে পারি; যাহাতে আমরা কি অর্থে ও মানে, কি যশে ও কীর্ত্তিতে, কি জ্ঞানে ও ধর্ম্মে, সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত আসন অধিকার করিতে পারি। আমাদিগকে এমন শক্তিসামর্থ্য প্রদান কর, যাহাতে আমরা অসহায়ের সহায়, এবং দুর্ব্বলের বল হইতে পারি; অনাথ ও আতুর যাহারা তাহাদের অভাব মোচন করিয়া তাহাদের শরীরে বল এবং মনে সুখশান্তি বিধান করিতে পারি। বিপদ আপদ যখন আমাদিগকে ঘিরিয়া ফেলে, আমরা যখন রোগশোকের অন্ধকূপে নিমগ্ন হইয়া শক্তিহীন অবস্থায় নিপতিত হই, তখন হে দুঃখবিনাশন ভগবান তুমিই আমাদিগের বর্ম্মদুর্গ হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিও; আমাদের দুঃখবিপদ, আমাদের রোগশোক সমস্তই বিদূরিত করিয়া আমাদের প্রাণে শান্তিবারি ঢালিয়া দিও। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই, জননীরূপে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছ, ইহা অন্তরে বুঝিবার শক্তি ও বুদ্ধি আমাদিগকে প্রদান কর। আমরা যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি—তুমি আমাদের কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাক।

সুখ আসিলে তাহাও যেমন তোমার দান বলিয়া গ্রহণ করি, দুঃখ আসিলে তাহাও যেন তোমার দান বলিয়া মস্তক পাতিয়া লই, দুঃখের ভারে আমরা যেন আপনাদিগকে চূর্ণবিচূর্ণ হইতে না দেই। তোমার প্রীতিসাধনের উদ্দেশ্যে আমরা যেন সর্ব্বদাই জনহিতকর কার্য্যে নিরত থাকি; স্বার্থের বশীভূত হইয়া কোনপ্রকার অমঙ্গল চিন্তাকে অন্তরে যেন স্থান না দেই বা কোন প্রকার অমঙ্গল কার্য্যে যেন হস্তক্ষেপ না করি। আমাদের চিন্তা ও কার্য্যকে যেন সর্ব্বদাই বিমল ও পরিশুদ্ধ রাখি। প্রতিদিন প্রভাতে আমরা যেন আমাদের জীবন তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া দিই এবং তোমার শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ মূর্ত্তি অন্তরে রাখিয়া, সেই পথে চলিতে অভ্যাস করি। হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর! আমাদের মস্তকে এই আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর, যাহাতে তোমার প্রতি আমাদের আস্থা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকে, যাহাতে তোমার প্রতি আমাদের সকল আশাভরসা অবিচলিতভাবে রক্ষা করিতে পারি এবং আমাদের ছোটবড় সকল কার্য্যে ও সকল অবস্থাতে তোমার সহিত অনন্যভাবে একাত্মযোগে যুক্ত থাকিতে পারি। আমাদের এই প্রার্থনা তুমি সর্ব্বতোভাবে সফল কর।

ওঁতৎসৎ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদারতা।*

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ, বি-এল)

অন্তহীন নীল আকাশ সমভাবে চিরবিরাজমান শ্যামলা ধরিত্রীর উর্দ্ধে। দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য এই আকাশের বুকে ফুটে উঠে'। বনপ্রান্তর গিরিদরী নদীসমুদ্র আলোকিত করে। রাত্রে সংখ্যাতীত গ্রহনক্ষত্র সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রমা কৌমুদী-প্রবাহে ভাসিয়ে দেয় কত বল্লী-বিতান, কুসুমকুঞ্জ, সুপ্তপল্লীর নিস্তব্ধকুটীর। এই আকাশের বক্ষ ভেদ করে বর্ষার বারিধারা নেমে আসে কৃষকের শস্যক্ষেত্রে—ঊষর মরুর বুকে শ্যামলিমার ছবি ফুটিয়ে তোলে। মাঝে মাঝে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত করে বজ্রনিনাদ ধ্বনিত হয় বটে, কিন্তু সে যেন পুত্রের মঙ্গলের জন্য পিতামাতার স্নেহশাসনের মতই মঙ্গলপ্রসূ—যা' ক্ষুদ্রদৃষ্টি মানব ঠিক বুঝতে পারে না। এই অসীম আকাশ দিন দিন ধরিত্রীর মঙ্গলসাধন করে চলেছে, দিন দিন ধরণীকে প্রেমের বন্ধনে বেঁধেছে। আকাশ ও ধরণী—এই উভয়ের মধ্যে মিলনগ্রন্থী রচিত হয়েছে সৃষ্টির প্রথম গরিমাময় প্রভাতে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবন পর্য্যালোচনা করলে আমরা তাঁর মধ্যে আকাশের এই উদার প্রেম-ভাব সম্যক্ পরিস্ফুট দেখতে পাই। বাল্যে এই আকাশের ভিতর দিয়ে ভগবানের অনন্তস্বরূপ তাঁর প্রাণে প্রতিভাত হয়েছিল; সংখ্যাহীন গ্রহ-তারকা, অগণিত সৌরমণ্ডল যে অনন্ত আকাশে ভ্রাম্যমাণ, সেই আকাশের রচয়িতা, সেই আকাশের স্রষ্টা কখনো সসীম হতে পারেন না—এই যে অসীমত্বের উপলব্ধি, ইহা

---

* গত ৬ই মাঘ আদিব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।

মহর্ষির প্রাণকে আকাশের মতই উদার মহান্ ও শাশ্বত সাম্যভাবে পরিপূর্ণ করেছিল।

আকাশ যেমন কারোর উপর কৃপা বিতরণে কার্পণ্য করে না, ধনীদরিদ্র-নির্ব্বিশেষে চাঁদের জ্যোৎস্না, সূর্য্যের কিরণ, তারার আলো, বর্ষার বারিধারা বিতরণ করে, মহর্ষিও সেইরূপ সমভাবে সকলকে গ্রহণ করেছেন, সকল ধর্ম্মের প্রতি, সকল উপাসকের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে গেছেন।

ভূতলে মানবপ্রাণে বৈরাগ্যের উদ্বোধক শ্মশান। রাজাপ্রজা, ধনিনির্ধন, পণ্ডিতমূর্খ, মানি-লাঞ্ছিত, পুরুষ-নারী, ব্রাহ্মণশূদ্র সকলেরই চরম পরিণতি এখানে। যিনি যত বড়ই হোন, বা যিনি যত ক্ষুদ্রই হোন মৃত্যুর হিম-শীতল স্পর্শে একদিন সকলেরই এই সাম্যাবস্থায় উপস্থিত হতে হবে। তাই কবি বলেছেন—

"বীরত্বের গর্ব্ব আর প্রভুত্ব বৈভব,
সম্পদ্-সৌন্দর্য্য সব যাহা করে দান,
অলঙ্ঘ্য মৃত্যুর হয় মুখাপেক্ষী সব –
গৌরবের পথ মাত্র মৃত্যুর সোপান॥"

এই মৃত্যুর কঠোর ছায়া বুদ্ধদেবকে নির্ব্বাণের পথে টেনে নিয়েছিল। পিতামহীর মৃত্যুকালে এই শ্মশানপ্রান্তে মহর্ষি সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মানন্দের অরূপ মাধুরী উপলব্ধি করেন। শ্মশানের ভীষণ-গম্ভীর বৈরাগ্যদ্যোতক মূর্ত্তির সঙ্গে আকাশ ও ধরণীর অপূর্ব্ব সমবায়ে মহর্ষির প্রাণের বীণায় বেজে উঠেছিল, আধ্যাত্মিক জগতের এক অতীন্দ্রিয় রাগিণী, যার প্রতি মূর্চ্ছনায় ক্ষরিত হয়েছিল অমৃতের ধারা; আর সেই অমৃতের সন্ধানে আত্মহারা মহর্ষি ধন-জন-সুঐশ্বর্য্য অকিঞ্চিৎকর ধূলিমুষ্টির মত তুচ্ছ মনে করে সাধনে ব্রতী হয়ে পড়েন।

শ্মশান-প্রান্তের অভূতপূর্ব্ব অনুভূতি মহর্ষির জীবনকে প্রশান্ত সাম্যভাবে পরিপূর্ণ করে তুলেছিল। জাগিয়ে তুলেছিল তাঁর প্রাণে শাশ্বতী সত্যনিষ্ঠা, মহা সমুদ্রের মত উদারতা, যার বলে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের পথহারা পথিককে স্বীয় মহতী স্নেহচ্ছায়ায় টেনে নিয়ে সন্তাপের তপ্ত বায়ু-প্রবাহ থেকে রক্ষা করেছেন।

যেদিন মহর্ষিকে তাঁর আত্মীয়স্বজন সকলে কৌশলে পৈত্রিক ঋণ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেদিন মহর্ষির জীবনের এক স্মরণীয় দিন—একদিকে সত্য ও দারিদ্র্য, অপরদিকে কৌশল বা মিথ্যা ও অগাধ ঐশ্বর্য্য শ্রীবৎস রাজার সম্মুখে শনি ও লক্ষ্মীর মত মহর্ষির মানসজগতে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সত্যব্রত সত্যসন্ধ মহর্ষি ঐশ্বর্য্যের লোভে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। পুণ্যশ্লোক ভীষ্মের মত সত্যের পদপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দুঃখ-দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন এবং ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্ষাত্রবীর প্রতাপসিংহের মত কেবলমাত্র সামান্য মাদুরের উপর সমগ্র পরিবারের শয্যা রচনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

যেদিন কিশোরবয়স্ক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সত্যের প্রেরণায় যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করে হিন্দুসমাজের তাৎকালিক প্রচলিত রীতিবিগর্হিত কার্য্য করেন, অথচ পুনর্ব্বার প্রায়শ্চিত্ত করে যজ্ঞোপবীত গ্রহণে অসম্মত হন, তখন হিন্দুসমাজ তাঁকে পরিত্যাগ করলেও, মহর্ষির স্নেহাঞ্চলে তিনি আশ্রয় ও শান্তি লাভ করেছিলেন।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও প্রথম জীবনে মহর্ষির স্নেহ-চ্ছায়ায় আশ্রয় লাভ করে তাঁহার মহতী প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করেছিলেন। পাখী যেমন পক্ষপুট বিস্তার করে স্বীয় শাবককে সকল বিঘ্নবিপদের হাত হইতে রক্ষা করে মহর্ষিও আশ্রিতজনকে সমস্ত পারিবারিক ও সাংসারিক অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে তেমনিভাবে স্বীয় মহতী উদারতার প্রভাবে রক্ষা করে গেছেন। তাঁদের হাত ধরে পরব্রহ্মের সাধন-পথে টেনে নিয়ে পথ চলেছেন।

মহর্ষির চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব তিনি বিশ্ব-জগতকে বহির্ভাগ থেকে না দেখে, তার মূল উৎপত্তিস্থলে গিয়ে দেখতেন। মানুষের যা কিছু ভেদ, বৈষম্য, বিবাদ, কলহ, দ্বেষ—সবই বহির্ভাগে পুঞ্জীভূত, যেমন আমরা মানবদেহের বর্ণ, গঠন, উচ্চতা প্রভৃতির দিক্ দিয়ে বৈষম্য দেখি, তেমনি যদি অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বিশ্লেষণ করি, দেখ্‌ব—সব দেহই রক্ত-মাংস-শিরা-উপশিরার সমষ্টি মাত্র; আরও গভীর স্তরে অবতরণ করলে সকলের আণবিক সমতাও পরিদৃষ্ট হবে। তখন যে সমস্ত পার্থক্য আমাদের পুরোভাগে বিশাল শরীর ধারণ করে দেখা দিয়েছিল, সবই তিরোহিত হবে। মহর্ষিও মানবকে দেখতেন—সকলেই "অমৃতস্য পুত্রাঃ"—সবই অমৃতের সন্তান, পরব্রহ্মের স্নেহের দুলাল—বাহ্যিক আচার-ব্যবহারে ভেদ-বৈষম্য হেতু রুচির পরিবর্ত্তনে বিভিন্ন পথে চলিতেছে; কিন্তু সকলেই ত পরমপিতার সন্তান—এই তত্ত্ব উপলব্ধি করে তিনি বিশ্বমানবকে "ভাই" বলে আলিঙ্গন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

যখন নীচে, পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে সুদূর শ্যামল শস্যক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তখন এটা রামের জমি, ওটা শ্যামের জমি, দূরবর্ত্তীটা হরির জমি—এইরূপ আলিবিভাগবিশিষ্ট হয়ে জমিগুলি দেখা দেয়; কিন্তু যখন পাহাড়ের উত্তুঙ্গ-শিখরে আরোহণ করি,

তখন দেখি— ক্ষুদ্রতার সঙ্কীর্ণতার মানদণ্ড আলিবিস্তাগ অন্তর্হিত হয়ে গেছে; দিগন্ত হতে দিগন্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত শ্যামলিমা নয়ন-মন মুগ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে; মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালা যে বিভিন্নতার রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছিল, তার স্থানে যেন কোন কুহকী ঐন্দ্রজালিক একখানা নীল চাদর পেতে রেখেচে।

সাধনার পবিত্র প্রেমে উদ্বুদ্ধহৃদয় মহর্ষি সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করে অনেক উচ্চ স্তরে আরোহণ করত মানব সমাজের বৈষম্য-বিভিন্নতা ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি দেখতেন—বিভিন্ন সম্প্রদায় দেশ-কালের পার্থক্যের মধ্য দিয়ে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পরব্রহ্মের চরণতলে ছুটে চলেছে, যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলধারা ভিন্ন ভিন্ন নগর-গ্রাম-জনপদের ভিতর দিয়ে একই মহাসাগরের দিকে ছুটে যায়। কোন কোন নদী যেমন ক্ষীণ জলধারা সাগরে নিয়ে পৌছাতে পারে না, পথিমধ্যে হয় ত মরুবালুকার অভ্যন্তরে লীন হয়ে যায়, কিন্তু বৃহৎ বেগবান্ জলপ্রবাহ যদি সেই ক্ষীণধারাকে পথিমধ্যে দেখ্‌তে পায়, তবে যেমন তাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে সাগরে পৌছে দেয়, :মহর্ষির বিশাল হৃদয়ও তেমনি ক্ষীণায়মান জীবনীশক্তিবিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়কে প্রকৃত পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে—সার্ব্বজনীনতার দিক দিয়ে সকলকে প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করেছে।

মহর্ষির আর একটি বৈশিষ্ট্য 'মধুকরবৃত্তি'। অবশ্য এ বিষয়ে রাজা রামমোহন পথপ্রদর্শক, আর মহর্ষি তাঁহারই অনুসৃত নীতির পরিপূরক। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মধুকর শ্রুতিসুখকর গুঞ্জনরবে মনপ্রাণ মুগ্ধ করে, পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে পরিভ্রমণ করে, পুষ্পের অভ্যন্তরে যে শ্রেষ্ঠ পদার্থ মধু বর্ত্তমান, তাই আহরণ করে; অন্য কিছুই গ্রহণ করে না; মহর্ষিও সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যা কিছু সত্য বা সার বস্তু দেখেছেন, তাই নিজের জন্য গ্রহণ করেছেন, স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিপোষক যেখানে যা পেয়েছেন, তাতেই নিজের হৃদয়-সাজি পূর্ণ করেছেন, মানস-উদ্যান সুসজ্জিত করেছেন।

এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হয়ে তিনি সুফি সম্প্রদায়ের রচনাবলী আলোচনা করেছেন; সিংহলে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে গভীর গবেষণায় নিরত ছিলেন, খৃষ্টধর্ম্মের পুস্তকাবলীও তিনি অধ্যয়ন করতেন।

সদ্‌গুরুপ্রসঙ্গ পুস্তকে দেখতে পাই, বিজয়কৃষ্ণ-গোস্বামী মহর্ষির রোগশয্যায় পার্কষ্ট্রীটের বাড়ীতে দেখা করতে গিয়ে দেখেছিলেন—রোগশয্যার জালাযন্ত্রণা উপেক্ষা করে মহর্ষি শান্তগম্ভীর-কণ্ঠে হাফেজের মর্ম্মস্পর্শী কবিতা আবৃত্তি করছেন। আর তাঁর দু'চোখ দিয়ে প্রেমাশ্রু নির্গত হচ্ছে॥

রামকৃষ্ণকথামৃতে দেখি, রামকৃষ্ণ পরমহংস যখন মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করতে আসেন, তখন তিনি পরমহংসদেবকে অত্যন্ত সমাদরের সহিত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর সন্তোষের জন্য মহর্ষি উপনিষদের কোন কোন অংশ পাঠ করে ব্যাখ্যাও করেছিলেন।

মহর্ষির প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মহর্ষির মতবাদের পূর্ণবিকাশ। প্রায় শতাব্দী ধরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছে; কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে উক্ত পত্রিকায় কোন রকম সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতমূলক কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নি, বা কোন অসাধু ভাষা প্রয়োগ করা হয় নি, সমভাবে সকলকে ধর্ম্মবিষয়ে গন্তব্যপথে অগ্রসর হতে সহায়তা করেছে; উদারতম সার্ব্বজনীন একেশ্বরবাদের আলোচনাই জগতের মঙ্গলপ্রসূ বলে ইহাতে প্রচারিত হয়ে আসছে।

উপনিষদ্-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাজা রামমোহনের একেশ্বরবাদ সাম্প্রদায়িকতার অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। নিখিল বিশ্বের সঙ্গে প্রেমময় সম্বন্ধ স্থাপনই তাহার কার্য্য, হৃদয়ের মালিন্য-কালিমা দূরীভূত করে "ভাই" বলে সকলকে আলিঙ্গন করাই এর বিশেষত্ব। মহর্ষিও একেশ্বরবাদের সার্ব্বজনীনতা স্বীয় জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করে গেছেন। সামাজিক আচার-ব্যবহারের ভেদ-বৈষম্যে কাহাকেও অবহেলা করা ত দূরে থাক, বরং বাহ্য বৈষম্যের অন্তরালে যে অভ্যন্তরগত সাম্য রয়েছে, তাই দেখে তিনি সকলকে সমভাবে গ্রহণ করেছেন।

এই ভাবের বাহ্যবিকাশে আমরা দেখ্‌তে পাই—তিনি নিজে যদিও কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ধারণ করতেন না, কিন্তু কোন দিন কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্নধারীকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন নি। সাম্প্রদায়িক চিহ্নধারী বা সাম্প্রদায়িক-চিহ্নত্যাগী নির্ব্বিশেষে উভয় সম্প্রদায়ই রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদি কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য তাঁহার নিকট আহ্বান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য কয়েকজন ব্রহ্মোপাসক সমাজের উপাসনা কার্য্য থেকে সাম্প্রদায়িক চিহ্নধারীকে বর্জ্জন করবার জন্য মহর্ষিকে অনুরোধ করেন, আর তাঁদের অনুরোধ রক্ষা না হলে তাঁরা ভিন্ন সমাজ গঠন করবেন বলে পত্র লেখেন, তখনও স্তুতিনিন্দায় অবিচলিত, মহর্ষি তাঁদের পত্রের উত্তরে যে অবিচলিত ধৈর্য্য, অপরিমেয় উদারতা, অলোকসামান্য প্রেমপরায়ণতা ও আশ্রিতবাৎসল্য প্রকাশ করেছিলেন, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মহর্ষিকে স্বীয় মতাবলম্বী করতে অসমর্থ হয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করলেন, কিন্তু মহর্ষি কোন দিন তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন নি, বরং নিজে কেশবচন্দ্রের গৃহে ও নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে গমন করে কি ভাবে উপাসনাকার্য্য পরিচালনা করলে সমাজের উন্নতি হবে, যে সম্বন্ধে যথেষ্ট উপদেশ দান করেছেন। কোন দিন কেশবচন্দ্রের কোন ন্যায়-সঙ্গত অনুরোধ মহর্ষি উপেক্ষা করেন নি; চিরদিন সমভাবে স্নেহচ্ছায়া বিতরণ করে গেছেন।

সত্যধর্ম্মের প্রচারে কৃতসঙ্কল্প মহর্ষি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন, যাহাতে জগদ্বাসী ক্রমে ক্রমে ভারতের জ্ঞানালোক লাভ করে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে। পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমূলার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঋগ্বেদের অনুবাদ দেখে স্বীয় প্রাণে ঋগ্বেদ অনুবাদের প্রেরণা লাভ করেছিলেন, একথা তিনি স্বীয় পুস্তকে স্বীকার করেছেন।

মহর্ষির প্ররোচনায় স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দান করেন, তাহাতে বিলাতে Comparative study of Religion বা তুলনামূলক ধর্ম্মালোচনার ভিত্তি স্থাপিত হয়; তাহার পূর্ব্বে ঐরূপ কোন সমিতি ইংলণ্ডে ছিল না।

বাস্তবিক মহর্ষির মহতী প্রতিভা, উদারতম ধর্ম্মমত, অবিচলিত সত্যনিষ্ঠা, সার্ব্বজনীন প্রেমপরায়ণতা, আশ্রিতবাৎসল্য প্রভৃতি গুণাবলীর যতই আলোচনা করি, ততই মহর্ষির প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়; ততই মনে হয় মহর্ষির মত আদর্শ মহাপুরুষকে দেশ-কালের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীঅভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখা সম্ভবপর নয়। মহর্ষি শুধু ব্রাহ্মসমাজের নন—তিনি পৃথিবীর যে কোন জাতির, যে কোন সমাজের, যে কোন দেশের ব্রহ্মোপাসকসম্প্রদায়ের আদর্শস্থানীয়; তিনি শুধু অতীতের নন; যে কোন কালে—বর্ত্তমান-ভবিষ্যতের কোণে যখনই মানবের সত্যনিষ্ঠা উদারতা সার্ব্বজনীনতার আদর্শ পুরোভাগে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন মনে হবে—তখনই মহর্ষির পুণ্য-মূর্ত্তি মনশ্চক্ষে ফুটে উঠবে। হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান মুসলমান—সকল সম্প্রদায়ই মহর্ষিকে নিজের ব'লে গৌরব করতে পারে; বঙ্গদেশ মহর্ষিকে অঙ্কে ধারণ করে ধন্য হয়েছে; হয়ত এমন দিন আসবে, যেদিন সমগ্র পৃথিবী মহর্ষির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান ক'রে নিজেকে ধন্য মনে করবে।

আজ মহর্ষির তিরোভাব-দিবস। সত্যব্রত ভীষ্মের মত সত্য রক্ষায় অটল অচল মহর্ষি রবির উত্তরায়ণ-সংক্রমণে পুণ্য মাঘমাসে চিরসমুজ্জ্বল ব্রহ্মলোকে গমন করেছেন। আজ তাঁর পুণ্যস্মৃতি সমবেত উপাসকমণ্ডলীর হৃদয়ের বীণায় সাম্যবাদের নবীন সুর ঝঙ্কৃত করুক। আকাশের অসীম ছায়াপথের তারায় আলোকে, বনান্তচারী সান্ধ্য সমীরের পরিমলসুরভিত প্রবাহে, সুরতরঙ্গিণীর অশ্রান্ত কলঝঙ্কারে, নৈশবিহগের পক্ষপুটসঞ্চালনের মধ্যে, প্রান্তর-বক্ষ বৃক্ষশীর্ষে অবস্থিত আলোকলতার পাতায় পাতায় খদ্যোতিকার নৃত্যচ্ছন্দে, সীমাহীন শব্দ-হীন মহালোকের বিজন নেপথ্য থেকে মহর্ষির উদারভাব, সত্যব্রতের পুণ্য আদর্শ মর্ত্ত্যের ধূলিমলিন আশাবাসনায় উদ্বেলিতহৃদয় ব্রহ্মোপাসকের প্রাণের গভীর স্তরে ফল্গু-ধারার মত নেমে আসুক, মহর্ষির জীবনব্যাপী সাধনা জয়যুক্ত হোক।

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

প্রাতঃকাল।

(৩রা মাঘে গীত)

বেদগান (সানুবাদ)।

(সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী)

মিশ্র ভৈরবী—তাল ফেরতা—একতালা ও তেওরা।

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়
আবিরাবীর্ম এধি
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্॥

অসৎ হতে দেব তুমি সত্যে লয়ে যাও মোরে।
আঁধারেতে দেব তুমি দেখাও হে জ্যোতি মোরে।
মৃত্যু হতে দেব তুমি পারে লয়ে যাও মোরে।
স্বপ্রকাশ প্রকাশ হও, চরণে তব শরণ দাও।
দেব হয়ে দক্ষিণমুখ করি' দূর যতেক দুখ
রক্ষা কর রুদ্র মোরে রক্ষা কর নিত্য মোরে॥

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

গুর্জ্জরী টোরী—তেওরা।

ধন্য বিশ্বনাথ তারক অযুত মালা
কণ্ঠ শোভিত ক'রে বিরাজিত;
সত্যরূপে সতত বিরাজিত—অন্ত তোমার—অন্ত কোথা?
তুমি আদি পুরাণ সব পাপহারী
প্রাণ সবারি—শঙ্কর দীনের হর হে ব্যথা।
ধরি চরণ, কৃপা করি' পাপ তাপ সব বিদূরি' হে,
রহিও চিতে সদা॥

(১১ই মাঘে গীত)

বেদগান (সানুবাদ) ।

ভৈরবী—পটতাল।

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥

অগ্নির অগ্নি হয়ে বিরাজেন সদা যিনি।
জলেতে স্নেহরূপে আছেন পশিয়া যিনি ॥
ওষধি বনস্পতি সবার দেবতা যিনি।
তাঁহারে ভক্তিভরে নমি—নমি—সদা নমি ॥

আলাইয়া—ধামার।

তাঁরি দেখ ভুবনে মোহন ভাব
মহিমা বিচিত্র সবে হে—
হর্ষে গাও, গাও, গাও, গাও।
শোন গগন অঙ্গনে বীণা বাজে তাঁহারি
জীবের প্রাণদায়ী।
প্রাণনাথ তিনি বন্ধু সখা তিনি
তিনি আছেন ভুবন তিন ভরি'—
তবু তুমি বন্ধু কেন বিষাদে মগ্ন পরাণ ?

ভৈরবী—সুরফাঁক্তা।

ওঙ্কার মহাদেব শঙ্কর তোমা
হেরিয়া মম পূরিল প্রাণের আশ।
নিয়তই ধরিছে ধ্যান
সুরনর তব রূপ মোহন
লভিয়া দরশন যায় ত্রাস।
হর দুঃখ দৈন্য নাশহে সব শঙ্কা।
চিত্ত তোমা সদা চাহে সুন্দরপ্রকাশ।
দীনহীন সেবকে রাখ হে পদপ্রান্তে—
তুমি মোর হে এক আনন্দনিবাস।

আশা—ঠুংরি।

তোমা সম প্রেমময় কে শুভদায়ী
আজি নব নব ভাবে ভাই বন্ধু মিলে সবে
বন্দনা গীত তব গাই।
আনন্দ সঙ্গীত হইয়া ধ্বনিত
গগন প্রাঙ্গণছায়
তারি সাথে একতানে গাহিবারে শত প্রাণে
প্রাণ-মন হেন সদা চায়।
হৃদয়ে হৃদয়ে আজি নাম তব উঠে বাজি
সুখবায়ু বহে সব ঠাঁয়।
শান্তিসাগর তুমি আনন্দ-আকর ভূমি
মন সদা তোমা পানে ধায়।
তোমারে না পাই যদি আর নাহি কোন গতি
মুক্তির নাহিক উপায়।
তোমারি চরণ দাও লইনু শরণ তায়,
রেখো প্রভু, রেখো তব পায়।
আশীষ দাও শিরে ঘরে যেন যাই ফিরে
তোমারি হেরি মুখভায়।
সংসার মাঝে ছোট বড় কাজে
মোদের হইও সহায়।

সায়ংকাল।

(৬ই মাঘে গীত)

বেদগান।

কল্যাণ—তেওরা।

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু।
মা মা হিংসীঃ ॥
বিশ্বানি দেব সবিতর্ দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।
নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ, নমঃ শঙ্করায় চ
ময়স্করায় চ, নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥

ইমন্—মধ্যমান।

হে প্রাণের দেবতা
তোমারি চরণে প্রাণ যেতে চায়।
অনেক পেয়েছি দুখ আঘাতে ভেঙ্গেছে বুক ;
লহ লহ তুলে তোমারি কোলে।

বাহার—কাওয়ালি।

চরণে শরণ দাও হে।
দীন শিশু আমি মাতা পিতা মম তুমি
চিরসাথী প্রাণের প্রাণ।
হৃদয়েরি ব্যথা যত কর তুমি বিদূরিত
পারি না বহিতে।
বর্ম্মদুর্গ তুমি ভয় বিপদ মাঝে
তব চরণ ছাড়ি প্রভু কোথা যাই—নাহি ঠাঁই
হে নাথ।

(রামপ্রসাদী সুর)

(মন) দেখ্ রে চেয়ে কে জেগে আছে।
গগন ভুবন চিত্ত-কমল
সকল ঠেঁয়ে সে যে আছে।
ঘুমিয়ে যবে রইবি সুখে
ঘরের ভিতর রইবি ঢ'কে
ভুল না করে জানিস্ রে ঠিক
মা তোর সদাই গায়ের কাছে।

স্থখেরি বান আসবে যবে
মরবি ছুখের ঘায়ে যবে
চোখ খুলে তুই দেখলে মায়ের
দেখবি রে হাত সবার মাঝে।
মিছা ভয় তুই করিস্ নোকো
তাঁ হ'তে দূর ফিরিস্ নেকো
শোন্ ওরে তুই প্রাণের মাঝে
ঐ বিজয়ডঙ্কা তাঁরি বাজে ॥

(১০ই মাঘে গীত)

বেদগান (অনুবাদ)।

কল্যাণ—তেওয়া।

ওঁ পিতা তুমি জ্ঞানদাতা হে। নমি তোমা—
ছেড়োনাকো মোরে।
যতেক দেব হে পিতা ছুরিত মোর করি' দূর
আশীষ তব বরিষ।
নমি দেব শম্ভব শুভদাতা হে,
নমি দেব শঙ্কর শুভাকর হে,
নমি দেব শিব শিবতর তোমায় হে ॥

ইমন্—চৌতাল।

তোমারি নামে জাগিল প্রাণ
তুমি মোর শান্তিসাধনধন
সকল দিশি নাম ধ্বনিছে তব নিরন্তর।
চন্দ্র স্থরজ গ্রহ তারাগণ শতেক ছন্দে
গাহে ধ্বনিয়া গগনে—শোনে অবাক যত দেবনর।
দীননাথ দীনবন্ধু দিবানিশি
তোমা ডাকে সেবক—তুমি হে সন্তাপহরণ।
দাও মোরে শুভ সম্পদ ছুঃখবিনাশন—
জগনাথ জগজীবন জগততারণ ॥

ভক্তলীলা।*

(ডাঃ শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

শ্রদ্ধেয়া মাতৃগণ এবং শ্রদ্ধেয় উপাসকমণ্ডলী! আমরা যদি অণুতত্ত্ব আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, একটী অণু আর একটী তাহার স্বজাতীয় অণুকে আকর্ষণ করে; এই আকর্ষণে মিলন সংঘটিত হয়। এইরূপ অসংখ্য অসংখ্য অণুর একত্র মিলনে একটী নূতন দ্বীপ, নূতন পাহাড়, নূতন দেশ রচিত হয়। ধর্ম্মজগতেও এইরূপ আকর্ষণ আছে। একটী সাধুজীবন আর একটী জীবনকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণে পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। এই মিলনের ভিতর দিয়াই নূতন আত্মিক জগৎ গঠিত হয়। প্রাচীনকালে যে সকল সাধু-জীবন, যে সকল ভক্তচরিত্র পৃথিবীতে লীলা করিয়া গিয়াছেন, এখন তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সৎসাহস ও দৃঢ়সংকল্প আমাদের চরিত্র গঠন করিতেছে; আমাদের মধ্যে তাঁহারা নবজন্ম গ্রহণ করিয়া যুগ-যুগান্তরের আবরণ ভেদ করিয়া নূতন স্বর্গরাজ্য নির্ম্মাণ করিতেছেন। তাহার একটী দৃষ্টান্ত আপনাদের নিকট নিবেদন করিব।

বর্ত্তমান পাটনা সহরের নিকটবর্ত্তী একটী স্থান আছে। তাহার নাম রাজগিরি, রাজগৃহ শব্দের অপভ্রংশ। এখানে মগধের বঙ্গরাজন্যবর্গের রাজধানী ছিল। স্থানটী বেশ সুন্দর। ছোট ছোট পাহাড় আছে, উপত্যকা আছে, প্রস্রবণও আছে। স্থানটী সাধন-ভজনের অনুকূল দেখিয়া শাক্যমুনি সশিষ্য এইস্থানে তপস্যা করিতেন। একদা শ্রীবুদ্ধদেব সশিষ্য যখন তপস্যা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অলৌকিক সাধনার কথা চারিদিকে প্রচারিত হইল। রাজগৃহের সন্নিকটে মহারাজ জেতের রাজধানী ছিল। তিনি কৌতূহলপরবশ হইয়া শ্রীবুদ্ধদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে আসিলেন। যেস্থানে বুদ্ধদেবের সহিত মহারাজ জেতের কথোপকথন হইয়াছিল, সেস্থানটী এখন জেতবন নামে প্রসিদ্ধ।

মহারাজ জেতের কৌতূহল হইবার কারণ এই যে, বুদ্ধদেব কপিলবস্তুর রাজার সন্তান—তিনি কেমন করিয়া ভিক্ষার দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ করেন; ধূলি তাঁহার শয্যা, বৃক্ষতল তাঁহার গৃহ, কখন রৌদ্রের উত্তাপে দগ্ধ হইতেছেন, কখন শীতের প্রকোপে কম্পান্বিত দেহে কাল কাটাইতেছেন। ইহা দেখিবার জন্য তিনি রাজ-গৃহে আগমন করিলেন। দেখিলেন—বুদ্ধদেব সশিষ্য ধ্যানমগ্ন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, দেহ স্থির ও অচঞ্চল। মুখ হইতে যেন এক অলৌকিক জ্যোতি তাঁহার গৌরবর্ণ মুখকান্তিতে খেলা করিতেছে। শিষ্যদিগের মুখ হইতে স্বর্ণছটার ন্যায় উজ্জ্বলরশ্মি ঝরিয়া পড়িতেছে। মহারাজ জেত কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নির্নিমেষ নয়নে শ্রীবুদ্ধদেবের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। গভীর অন্ধকারে একটী প্রদীপ যেমন পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেইরূপ বুদ্ধদেবের ধ্যানদীপ্ত মূর্ত্তিটী জেতকে আকৃষ্ট করিল। মহারাজার ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

প্রতীক্ষা করিতেলাগিলেন—কখন্ ধ্যান ভঙ্গ হইবে। দিনের পর দিন চলিয়া গেল। ধ্যান ভঙ্গ হইলে মহারাজ জেত করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—ভগবান বুদ্ধ! আমাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করুন। শ্রীবুদ্ধদেব সচকিতনেত্রে

* গত ১০ই মাঘ আদিব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।

একবার মহারাজ জেতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন যে, রাজবেশে দণ্ডায়মান এক সুপুরুষ ধর্ম্মার্থী হইয়া আগমন করিয়াছেন। বুদ্ধদেব বলিলেন,—মহারাজ অপেক্ষা করুন—এখনও সময় হয় নাই। তিনি নিরাশ অন্তরে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কেন আমার প্রার্থনা বুদ্ধদেব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অনেক চিন্তার পর এই স্থির হইল যে, বুদ্ধদেব সন্ন্যাসী, আমি রাজা—বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী। সন্ন্যাসী হইয়া রাজ্যেশ্বর রাজাকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবেন কিরূপে? অতএব আমার সন্ন্যাস গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য।

এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মহারাজ জেত অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিলেন, প্রজাবর্গকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করিলেন, রাজমহিষীর নিকট পরিচারিকা প্রেরণ করিলেন; কাশী, কাঞ্চী, দাক্ষিণাত্য, ব্রহ্মপুত্র-প্রদেশ, উৎকল, মিথিলা, পঞ্চনদপ্রদেশ, কান্যকুব্জ, মথুরা, হস্তিনাপুর—ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন। যখন তাঁহারা সকলে রাজধানীতে সমবেত হইলেন, তখন মুণ্ডিতমস্তক, পীতবস্ত্রধারী মহারাজ সসম্ভ্রমে ব্রাহ্মণদের প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে অমাত্য-বর্গ, হে ব্রাহ্মণগণ, হে প্রজাবৃন্দ, হে রাজমহিষী! তোমরা সকলে সাক্ষী হও; আজ হইতে আমি এ রাজ্যপাট ত্যাগ করিলাম, আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীবুদ্ধ-দেবের শরণাগত হইলাম। আমি নির্ব্বাণধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার আশ্রয় অন্বেষণ করিব। অমাত্যবর্গ স্তম্ভিত হইলেন, প্রজাগণ হাহাকার করিয়া উঠিল, রাজ-মহিষী অবাতকম্পিত দীপশিখার ন্যায় স্থিরনেত্রে রাজার দিকে তাকাইয়া রহিলেন,—একটী কথাও বলিলেন না। মহারাজ জেত বীরের ন্যায় নিজ সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য শ্রীবুদ্ধ-দেবের নিকট গমন করিলেন এবং দেখিলেন—শ্রীবুদ্ধদেব সমাধিমগ্ন, দেহ স্থির, নিশ্চল, চক্ষু নিমীলিত; শিষ্যগণও ধ্যানমগ্ন। নবীন ভিক্ষু করযোড়ে দিনের পর দিন ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ধ্যান ভঙ্গ হইলে নিবেদন করিলেন। ভগবান বুদ্ধ! আমি রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছি। অতএব আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন। বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, হে সন্ন্যাসী! অপেক্ষা করুন। একি! এখনও অপেক্ষা! নিরাশায় মহারাজ জেতের মুখ মলিন হইল। নিদারুণ আঘাতে মনের সন্ধি চূর্ণ হইল, চারিদিক গভীর অন্ধকারে পূর্ণ। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের প্রখর-কিরণ অমাবস্যার গভীর আঁধারে পরিণত হইল। রাজা ক্ষোভে ও মনস্তাপে নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি রাজ্য ত্যাগ করিয়াছি বটে, সন্ন্যাসী হইয়াছি একথাও সত্য, কিন্তু আমার একমাত্র পুত্র আমার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে না, একথা ত আমি কাহাকেও জানিতে দিই নাই। শ্রীবুদ্ধ অন্তর্দ্দর্শী; বোধ হয় একথা জানিতে পারিয়া আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। যেরূপেই হউক আমি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবই।

তিনি পুনরায় রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন, ব্রাহ্মণশ্রমণ অমাত্যবর্গ প্রজাবৃন্দ রাজমহিষী যুব-রাজ সকলকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। একটী বিশেষদিনে সকলে যখন সমবেত হইল, তখন মহারাজ জেত নিবেদন করিলেন, তোমরা সকলে সাক্ষী হও। আমি আমার এই বিশালরাজ্য আজ হইতে বৌদ্ধসঙ্ঘকে দান করিলাম। আমার হীরকখচিত রত্নসিংহাসন ও আমার রাজপরিচ্ছদের মণিমুক্তা আভরণ—আমি সমস্তই বৌদ্ধসঙ্ঘকে দান করিলাম। এই সংবাদ পাইয়া রাজ্যের মধ্যে মহাবিপ্লব সংঘটিত হইল। কেহ রোদন করিতেছে, কেহ হাহাকার করিতেছে, কেহ মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে, কেহ উদাসহৃদয়ে ঊর্দ্ধনেত্রে তাকাইয়া আছে, মহারাজ জেত সেদিকে দৃক্‌পাত করিলেন না। শ্রীবুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আবার উৎফুল্ল হইয়া নিবেদন করিলেন—হে ভগবান বুদ্ধ! আমি রাজ্য, ধন, স্বর্ণসিংহাসন রাজ-কোষের প্রভূত অর্থ—সমুদায় সঙ্ঘকে দান করিয়াছি; অতএব কৃপা করিয়া আমাকে ধর্ম্মে দীক্ষা দান করুন। বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন; হে ধর্ম্মার্থী অপেক্ষা করুন। জেতের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। নিরাশ অন্তরে তিনি এক গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন। চিন্তা করিতে লাগিলেন, শিষ্যত্বে গ্রহণ না করিবার কারণ কি? মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, বোধ হয় আমি ধন-সম্পদ ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু আমার রাজমহিষীকে ত ত্যাগ করি নাই। সেইজন্য আমি শ্রীবুদ্ধের শিষ্যত্বের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলাম।

তিনি পুনরায় গৃহাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, এবং প্রজাবৃন্দকে ও অমাত্যবর্গকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তাহাদিগকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, আমি আজ হইতে রাজমহিষীকে ত্যাগ করিলাম। এই সংবাদ রাজ্যে মুহূর্ত্তে প্রচারিত হইল। সর্ব্বত্র মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল। সূর্য্য কালমেঘে সাতদিন ঢাকা পড়িল। ধরিত্রীবক্ষে মুহুর্মুহু ভূকম্প হইতে লাগিল, যেন শোকে ভয়ে অধীর হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। পক্ষীগণ কুলায়ে নীরব হইয়া

বসিয়া রহিল। প্রজাগণ মহারাজকে ধিক্কার দিতে লাগল। কিন্তু রাজমহিষী সান্ত্বনা দিলেন, বলিলেন—মহারাজ, আমাকে আপনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না—আপনার আত্মার সহিত আমার আত্মা মিলিত। আপনি আমার একার্দ্ধ, আমি অপরার্দ্ধ। যদি ভগবানের নিকট আত্ম-সমর্পণ করেন, তবে একার্দ্ধ দান করিলে দান অসম্পূর্ণ হইবে। আর যদি পূর্ণ দান করেন, আমি আপনার সহিত অবিচ্ছিন্ন-যোগে যুক্ত থাকিবই। আমার শরীরই আমি নই। এই মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ আশ্বস্ত হইলেন। প্রজাবর্গ ধৈর্য্য ধারণ করিল। জেত প্রমত্ত মাতঙ্গাদির মত মহোল্লাসে শ্রীবুদ্ধের শরণাপন্ন হইলেন। করযোড়ে নিবেদন করিলেন, হে প্রভু! আমি আমার রাজমহিষীকেও ত্যাগ করিয়াছি। শ্রীবুদ্ধ বলিলেন, অপেক্ষা করুন।

এখনও অপেক্ষা! আমার আর কি আছে! বৃদ্ধা মাতা আছেন, একমাত্র পুত্র আছে, মহারাজ তাঁহাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া যখন ত্যাগের চরম সীমায় উপনীত হইলেন, তখন শ্রীবুদ্ধদেব বলিলেন,—মহারাজ জেত, আপনি সকলই পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে কিন্তু একটী বস্তু ত্যাগ করেন নাই—সেটী কি? সেটী "আমি"! আমিত্ব ত্যাগ না করিলে নির্ব্বাণলাভ হয় না। যে আত্মায় "আমি" বিরাজ করে—আমিত্বে যে আত্মা পূর্ণ, সেখানে ভগবানের স্থান হয় না। অবশেষে মহারাজ জেত তপস্যা দ্বারা আমিত্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীবুদ্ধদেবের শিষ্যত্বের পবিত্র অধিকার লাভ করিলেন।

বন্ধুগণ! উৎসবের মহা প্রস্তুতি এই আমিত্বত্যাগ। সকল বস্তু হইতে আত্মাকে শূন্য কর; দেখিবে, সেখানে ব্রহ্ম বিরাজ করিবেন—তোমার শূন্য আত্মা পূর্ণ হইবে। ব্রহ্মকৃপাই আমাদিগের সম্বল। এই কৃপার ভিখারী হইয়া প্রার্থনা করুন, তিনি প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

ললিত—সুরফাঁক্তা।

পান্থ এখন কেন অলসিত অঙ্গ।
হের পুষ্পবনে জাগে বিহঙ্গ।
গগন মগন নন্দন আলোক উল্লাসে, লোকে লোকে উঠে প্রাণতরঙ্গ।
রুদ্ধ হৃদয়কক্ষে তিমিরে কেন আত্মসুখদুঃখে শয়ান;।
জাগ জাগ চল মঙ্গল পথে, যাত্রীদলে মিলি লহ বিশ্বের সঙ্গ॥

স্বরলিপি—৺কাঙ্গালীচরণ সেন। গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II সা -ঋা মা মা। মা মা। মা মা -া -া I মা মা মা মা। মগা -পমা। মা -া -পগা -া I
পা ন্ থ, এ খ ন কে ন ০ ০ অ ল সি ত অ০ ০০ ঙ্গ ০ ০ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I গা -মা গা ঋা। -া সনা। সা ঋা -া -া I সা -ঋা পা মা। গা -া। -ঋা -া সা -া II
হে ০ র, পু ০ ষ্প০ ব নে ০ ০ জা ০ গে বি হ ০ ০ ০ ঙ্গ ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II{পা পা মা পা। দা র্সা। র্সা -া র্সা র্সা I র্সা -ঋা র্সঋা -র্সঋা। ঋা ঋর্সা। র্সা -নর্সা ণা -দা}I
গ গ ন, ম গ ন ন ন্ দ ন আ ০ লো০ ০০ ক, উ০ ল্লা ০ সে ০

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩

I পা -দা দা দা | -র্ঋর্সা র্সা | র্সনা -র্সা ণা -দা I পা -া পা পমা | পা -ণা | দা -পা -মা -গা II

লো • কে লো • • কে উ • • ঠে • প্রা • ণ, ত • র • ঙ্গ • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩

II সা -ঋা ঋা ঋসা | সা সা | সা -ঋা ঋা -া I ঋা মা মা -া | -া -পগা | -া -া -া -া I

ক্র • ন্দ, হৃ • দ য় ক • ক্ষে • তি মি রে • • • • • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩

I গা -মা গা ঋা | -া সন্া | সা ঋা -া -া I সা ঋা মপা মা | গা -া | -ঋা -া সা -া I

কে • ন, আ • শ্ব• সু খ • • দুঃ • খে, শ য়া • • • ন •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩

I {পা -দা মা পা | -দপা দা | র্সা র্সা -া -া I র্সর্ঋা -র্গা র্ঋা র্ঋা | র্সা নর্সা | ণা -া -দা -পা} I

জা • গ, জা • • গ চ ল • • ম • • ঙ্গ ল প • থে • • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩

I পা -দা র্ঋা র্সা | র্সা -া | ণা র্সণা ণদা দা I পা -া পা পমা | পা -ণা | দা -পা মা -গা IIII

যা • ত্রী, দ লে • মি লি• ল• হ বি • শ্বে র • স • ঙ্গ • • •

আশাবরী—ঝাঁপতাল।

মনোমোহন গহন যামিনী শেষে
দিলে আমারে জাগায়ে।
মেলি দিলে শুভ প্রাতে সুপ্ত এ আঁখি শুভ্র আলোক লাগায়ে।
মিথ্যা স্বপনরাজি কোথা মিলাইল, আঁধার গেল মিলায়ে;
শান্তিসরসী মাঝে চিত্তকমল ফুটিল আনন্দ বায়ে॥

স্বরলিপি—৺কাঙ্গালীচরণ সেন। গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২´ ৩ • ১ ২´ ৩

II ঋা মা | পা -া র্সণা | ণা -দা | দা দা পা I মা -া | পা পদা মপা |

ম নো মো • হ• ন • গ হ ন যা • মি নী• •

• ১ ২´ ৩ • ১

| মজ্ঞা -া | ঋা -সা -া I ণ্সা -া | দ্দা -া ণা | সা -ঋা | মা -া পা I

শে • ষে • • দি• • লে •, আ মা • রে •, জা

২´ ৩ • ১

I মমা না | জ্ঞা -া -া | -ঋা -া | সা -ণা -সা II

গা • য়ে • • • • • • যে • •

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II {মা পা। ণদা -ণর্সা ণা। র্সা র্সা। র্সা -া র্সা I র্সা -া। র্সর্ঋা র্জ্ঞা র্ঋা।
যে লি দি ০০ লে ও ভ প্রা ০ তে সু প্ ত০ ০ এ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্সা ণর্সা। ণা -দা -পা} I পা -দা। দা -র্ঋর্সা র্সা। র্সর্ঋা -ণা। দা -া পমা I
আঁ ০০ খি ০ ০ ও ০ র ০০, আ লো০ ০ ক ০, গা০

২´ ৩ ০ ১
I পা -ণা। -দা -দা -পা। -মা -জ্ঞা। -জ্ঞা -ঋা সা II
গা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়ে

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II সা -া। দা -া দা। দা দপা। পা -া পা I পমা -পা। পণা -দা দা।
মি ০ থ্যা ০, স্ব প ন০ রা ০ জি কো০ ০ থা০ ০ মি

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। পা -মা। পা মজ্ঞা -াম I সা -া। সা -দা পা। মপা -জ্ঞা। ঋা -া সা I
লা ০ ই ল ০ আঁ ০ ধা ০ র গে০ ০ ল ০, মি

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I ঋা মা। -পণা -দা -পা। -মা -জ্ঞা। -জ্ঞা -ঋা সা I {মা -পা। ণদা -ণর্সা ণা।
লা ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়ে শা ন্ তি ০০, স

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্সা র্সা। র্সা -া র্সা I র্সা -া। র্সর্ঋা -র্জ্ঞা র্ঋা। র্সা -ণর্সা। ণা -দা -পা} I
র সী মা ০ ঝে চি ০ ও০ ০, ক ম ০০ ল ০ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I পা -দা। দা -র্ঋর্সা র্সা। র্সর্ঋা -ণা। দা -া পমা I পা -ণা। -দা -দা পা।
ফু ০ টি ০০ ল আ০ ০ ন ন্ দ০ বা ০ ০ ০ ০

০ ১
। -মা জ্ঞা। -জ্ঞা -ঋা সা II II
০ ০ ০ ০ য়ে

ভৈরবী—সুরফাঁক্তা।

আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি,
তুমি হে মহা সুন্দর, জীবননাথ।
শোকে দুখে তোমার বাণী জাগরণ দিবে আনি, নাশিবে দারুণ অবসাদ।
চিতমন অর্পিনু তব পদপ্রান্তে, শুভ্র শান্তি শতদল পুণ্য মধু পানে,
চাহি আছে সেবক তব সুদৃষ্টিপাতে কবে হবে এ দুখ রাত প্রভাত॥

স্বরলিপি—৺কাঙ্গালীচরণ সেন। গান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১´ ২ ৩ ১´ ২
II সা -া -র্সা -াণ। ণা -দা। ণণা দা পা মা I পা -ণা দা -াপ। মজ্ঞা -া।
আ ০ ০ ০ ন ন দ, তু মি ০ স্বা ০ মী ০ ম ০

৩ ১´ ২ ৩ ১´
। মা জ্ঞা ঋা সা I ঋা সা দ্‌া ণ্‌া। সা -ঋা। জ্ঞা -া মা মা I পা -ণা দা পা।
ব ল, তু মি তু মি হে, ম হা • সু ন্ দ র জী • ব ন

২ ৩
। মা -পা। -জ্ঞমা -জ্ঞা -ঋা সা II
না • •• • • থ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II{দা দা দা ণা। ণা র্সা। র্সা র্সা -া র্সা I দা র্জ্ঞর্ঋা র্জ্ঞর্ঋা র্জ্ঞা। র্মা র্মা। -া -া -া -দা I
শো কে দুঃ খে তো মা রি, বা • ণী জা গ • র • ণ দি বে • • • •

১´ ২ ৩ ১´
I পা -দা -ণা -র্সা। র্ঋা র্জ্ঞা। র্জ্ঞর্সা -র্ঋণা র্সা -া} I দা -র্সণা র্সা র্সা I
আ • • • • • • • •• • • নি • না • • শি বে

২ ৩ ১´ ২ ৩
। র্সা -র্ঋর্সা। ণা র্সণা,দা পমা I পা -ণা -দা -পা। -মা -পা। -জ্ঞমা -জ্ঞা -ঋা সা I I
দা • •• রু ণ•, অ ব • সা • • • • • • • • • • দ

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II সা সা সা ঋা। জ্ঞা -া। মা মা -া -া I মা মা ঋা মা। জ্ঞা -ঋা। জ্ঞা -া -া -া I
চি ত ম ন অ • র্পি নু • • ত ব প দ প্রা ন্ তে • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I দ্‌া -া ণ্‌া জ্ঞা। -া মা। জ্ঞা ঋা সা সা I পা -ণা দা পা। মা -পা। জ্ঞমা -জ্ঞা -ঋা সা I
শু • ভ্র, শা ন্ তি শ ত দ ল পু • ণ্য, ম ধু • পা• • • নে

১´ ২ ৩
I{দা -দা মা দা। -ণদা ণা। র্সা -া র্সা র্সা I দা র্জ্ঞর্ঋা র্জ্ঞর্ঋা র্জ্ঞা। -া র্মর্জ্ঞা।
চা • হি, আ •• ছে সে • ব ক ত ব • সু • দৃ • ষ্টি •

৩ ১´ ২ ৩
। র্জ্ঞা -র্ঋা -র্সা -া} I দা র্ঋা র্সা ণা। -র্সণা ণা। পদা -া পা মা I
পা • তে • ক • বে, দু •• বে এ • ছ খ

১´ ২ ৩
I পা -ণা দা পা। মা -পা। -জ্ঞমা -জ্ঞা -ঋা সা II II
রা • ত, প্র ভা • •• • • ত

বিকাশ চেষ্টা।*

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

ব্রহ্মাণ্ডরচনার সেই আদিমতম যুগ হইতে এক বিশাল প্রকাশ-চেষ্টা সৃষ্টির ভিতরে অদম্যভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছে। অবিশ্রান্ত সে প্রচেষ্টা, তাহার বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। অন্ধকারে যখন অন্ধকার প্রচ্ছন্ন ছিল, দিগন্তব্যাপী নীহারিকা যখন চারিদিক সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তখন হইতেই বিকাশের সূচনা। অদ্যাপিও এই শোভনতম বিশ্বে সেই প্রচেষ্টার অবসান হয় নাই। যতকাল এই জগতের পরমায়ু থাকিবে, ততকাল ধরিয়া এই বিকাশাত্মক ভাব কার্য্য করিতে থাকিবে। যখন চারিদিক ধূমায়মান, সৃষ্টির স্পন্দন যে দিন প্রথম জাগিয়া উঠিল, তখন সেই অন্ধকারের ভিতর হইতে বিকাশ-ফলে উত্তাপ আবির্ভূত হইল। সেই উত্তাপের কতক অংশ জলে পরিণত হইল। সেই বিশ্বব্যাপী জলের ভিতর হইতে এই সুকঠিন পৃথিবী বাহির হইয়া পড়িল। ক্রমে আকাশকে লক্ষ্য করিয়া অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণী মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক জলস্থলে এই ধরণীকে বিভক্ত করিয়া দিল। আকাশে কত জ্যোতিষ্কমণ্ডল দূরদূরান্তরের অগণ্য সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেহ বা শীতলতালাভে, কেহ বা এখনও জলন্তভাবে মহাগগনে আপন আপন কক্ষপথ খুঁজিয়া লইল। ক্রমে ধরণীর গাত্রে অসংখ্য ফুল-ফলবৃক্ষ সঞ্জাত হইল। পৃথিবীর সঙ্গে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সুনির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। এ সমস্তই সেই মহাশক্তিসম্পন্ন জগৎস্রষ্টার অনুপম কৌশল। তিনি তাবতের ভিতরে থাকিয়া সকলকে শক্তিবিধান করিতেছেন—বিকাশের মন্ত্রে সকলকে দীক্ষাদান করিতেছেন; সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—আরও বিকশিত হও।

বীজের ভিতর হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইতেছে। অঙ্কুর হইতে ক্রমে কাণ্ডের রচনা। কাণ্ডের চারিপার্শ্বে শাখা-প্রশাখার বিকাশ, আবার সেই কাণ্ড হইতে বৃক্ষের পরিণতি। এক বিকাশ-চেষ্টা ওষধি-বনস্পতির জন্মতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের মৃত্যুদিন অবধি কার্য্য করিতেছে। এই বিকাশই জগতের প্রাণ, এই বিকাশেই জগতের অপূর্ব্ব শোভা-সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি।

জ্ঞানের রাজ্যে এই বিকাশের কার্য্য যাহা চলিতেছে, একবার তাহা আলোচনা করিয়া দেখ। কোথায় সেই সুপ্রাচীন যুগে স্থূলায়তন বৃক্ষের মূলে অগ্নি প্রদান করিয়া বা কুঠার আঘাতে তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া, পরে অগ্নিপ্রদাহে এবং প্রস্তরনির্ম্মিত কুঠারের সাহায্যে তাহার বক্ষ খোদিত করিয়া ক্ষুদ্র ভেলা-নির্ম্মাণে নদীপথে বিচরণ,—আর বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞানের বিকাশফলে মহাসাগরের বক্ষ-বিক্ষোভকারী দিগন্তগামী অর্ণবপোতের রচনা! লোকমুখে সময়সাপেক্ষ সংবাদপ্রেরণের স্থলে আজকালকার দিনের তড়িত-যোগে মুহূর্ত্তের মধ্যে লক্ষবার সংবাদপ্রেরণের ব্যবস্থা। নিরবচ্ছিন্ন পদচারণার স্থলে বর্ত্তমান কালের বাষ্পীয় শকট বা খপোতযোগে দূরদূরান্তর গমনের সহজ ব্যবস্থা। নানা যন্ত্রযোগে নিত্যব্যবহার্য্য বিবিধ সামগ্রীর গঠন আজকালকার দিনে হস্তজাত শিল্পকে অবসর দান করিতে বসিয়াছে। জ্ঞানের এই অকুণ্ঠিত বিকাশের ফলে জড়ের জড়ত্ব-বোধের ধারণা তিরোহিত হইয়া যাইতেছে।

উদ্ভিদের ভিতরে প্রাণন-ক্রিয়া মনুষ্যদেহের মত শিরা উপশিরা ও স্নায়ুমণ্ডলীর ভিতর দিয়া যে কার্য্য করে, তাহার পরিচয় পাইয়া স্তব্ধ হইয়া যাইতেছি। আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সঙ্গে আমাদের এই ধরণীর যে প্রাণের যোগ রহিয়াছে, তাহা জানিতে পারিয়া বিস্মিত হইতেছি। একবার মানবসমাজের আদিম অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে যে, জ্ঞানের বিকাশ জগতে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিয়াছে! মানবের হস্তে নগর-গ্রামের অনুপম শোভা-সৌন্দর্য্য কি সুন্দরভাবে ভাস্বর হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান সময়ের সুতান বাদ্যযন্ত্র পুরাকালের একতন্ত্রী বা ত্রিতন্ত্রী যন্ত্র নহে। রাগরাগিণীসমন্বিত বর্ত্তমানের হৃদয়োন্মাদী সঙ্গীত, পুরাকালের সহজ সঙ্গীত নহে। বর্ত্তমানের সুশোভন বেশভূষা, অতীতের বল্কল-আচ্ছাদন নহে। চারিদিকে জ্ঞানের উন্মেষ—বিকাশের নিরুপম স্ফূর্ত্তি। এই বিকাশকে রুদ্ধ করিবার বৃথা প্রয়াস পাইলে চলিবে না। এই বিকাশই যে জগতের স্বাভাবিক গতি। ইহাকে বলপূর্ব্বক প্রতিরুদ্ধ করিতে যাও, জ্ঞানের আলোক নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, আমাদিগকে আবার বর্ব্বর অবস্থায় ফিরিতে হইবে।

কেবল কি জড়জগতে?—উদ্ভিদরাজ্যে, জীবরাজ্যে ও জ্ঞানের রাজ্যে এই বিকাশের কার্য্য চলিতেছে। আধ্যাত্মিক-রাজ্যে এই বিকাশের পদধ্বনি আমাদের কর্ণে কি সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় নাই? একবার ধর্ম্মের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ঘাটিত করিয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে প্রেত-পূজা, বৃক্ষপূজা, জড়পূজা, মেঘ বজ্র বিদ্যুতের লীলাময় বিভীষিকার পূজা, অগ্নিসূর্য্যের ভাস্বর মহিমার পূজার ভিতর দিয়া কেমন সোপানপরম্পরায় নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মজ্ঞান

* ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে আদিব্রাহ্মসমাজে বিবৃত।

বিকশিত হইবার সুযোগলাভ করিয়াছে। স্তরে স্তরে অধ্যাত্মতত্ত্ব কেমন শোভন মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তুমি তাহাকে ক্রমিক ধর্ম্মসংস্কার বলিতে পার, আমি তাহাকে নামান্তর দিয়া বলিব বিকাশ।

জ্ঞানের রশ্মি যখন সুস্নিগ্ধ আলোক বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে, প্রেমভক্তি যখন মলয়ানলের ন্যায় চামর ব্যজন করিতে থাকে, জনসেবা ও ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত কর্ম্মের ভাব যখন জাগিয়া উঠে, বৈরাগ্যের ভাব যখন স্ফূর্ত্তিলাভের চেতনা প্রাপ্ত হয়, যখন সময়ের আহ্বান সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে, তখনই সর্ব্ববিধ ভস্মাচ্ছাদন বিদূরিত করিয়া সার্ব্বজনীন সমুচ্চ ব্রহ্মজ্ঞানের আগমনপথ প্রশস্ত হইয়া যায়।

১০২ বৎসর অতীত হইতে চলিল, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ধর্ম্মক্ষেত্রে এই বিকাশের নবতর বাণী শ্রবণ করিয়া এই পুণ্যদিনে ব্রাহ্মসমাজের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন, আমাদের সম্মুখে গতি-মুক্তির পথ অনাবৃত করিয়াছিলেন, জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাহারই জন্য আমাদের এই আনন্দকোলাহল এই উৎসবক্ষেত্রকে আজ মন্ত্রে ও সঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছে। আমরা প্রাচীন ভাবকে সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাকে সমাধিস্থ করিবার জন্য আজ এখানে আসি নাই। প্রাচীনত্বের সহিত জ্ঞানোন্নত বর্ত্তমানের মধুর যোগ স্থাপন করিয়া, সত্যের নিকষে উপনিষদের মন্ত্রকে পরীক্ষা করিয়া, তাহারই অবলম্বনে ব্রহ্মপূজার আয়োজন করিয়াছি। যাহা কিছু সত্যের বিরোধী, বিশ্বপ্রেমের বিরোধী, প্রকৃত মনুষ্যত্বের ও হৃদয়ের বিরোধী, তাহা আমাদের নহে। সকল ধর্ম্মের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু অবলম্বনীয়, শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তৎসমস্তই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার সঙ্গে ত্যাগের ভাব, নিষ্ঠার ভাব, বৈরাগ্যের ভাব, পবিত্রতার ভাব—যাহা এই ভারতীয় সাধনার অস্থিমজ্জাগত, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে।

ঈশ্বর আমাদিগকে প্রতিমুহূর্ত্তে জ্ঞানে, প্রেমে, ঔদার্য্যে, সত্যে বিকশিত হইবার প্রেরণা দান করিতেছেন। সে বাণীর প্রতি বিমুখ হইলে চলিবে না। স্মরণে রাখিতে হইবে যে, আপনাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য ধরাপৃষ্ঠে আমাদের আগমন। প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় আপনাকে বিকশিত করিয়া যেদিন আমরা আপনাকে তাঁহার পদপ্রান্তে ধরিতে পারিব, সেই দিনেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল নিজে ফুটিলে চলিবে না, প্রস্ফুটিত হইবার এই আশা আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা যদি আমরা জনসমাজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারি, তবেই আমাদেরও এবং এই ব্রাহ্মসমাজেরও এই মাঘোৎসবের পরম সফলতা।

হে সমাগত সাধুসজ্জনগণ! জ্ঞান ও প্রেমভক্তির মিলনে যে বিকাশ আজ পুণ্যদিনে আমাদিগকে স্পর্শ করিতেছে, তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে, সত্য দেশকালে বদ্ধ নহে। বিকাশ কোন এক যুগে বা দেশে আবির্ভূত হইয়া চিরনীরবতা লাভ করে না। নির্ব্বিকারচিত্তে আলোচনা করিয়া দেখ, ধর্ম্মের সহিত তোমার জ্ঞানের যোগ রক্ষিত হইতেছে কি না। শাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লইয়া প্রচলিত বিশ্বাসকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছ; কিন্তু স্থির জানিও, এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও বিকাশের একটা দিক্। নববিধ মতের, নববিধ ধারণার অবলম্বন-পথে বিভীষিকা থাকিতে পারে, একথা অস্বীকার করি না, কিন্তু জ্ঞান যখন তাহার প্রহরী, প্রেমভক্তি যখন তাহার নিত্যসঙ্গী, বেদ-উপনিষদ যখন তাহার পথপ্রদর্শক, সত্য যখন তাহার মূলে—ভয়শূন্য হও। সত্যে প্রেমে ভক্তিতে দীক্ষিত হইয়া তোমার জীবনে বিকাশের পথকে প্রমুক্ত করিয়া দাও, এবং ধর্ম্মের বিমল আনন্দ উপভোগ কর।

হে পরমাত্মন্! সত্যের আহ্বানে, জ্ঞানের আহ্বানে, সুপ্রাচীন শাস্ত্রের আহ্বানে—সর্ব্বোপরি তোমার আহ্বানে আজ আমরা এখানে মিলিত হইয়াছি। তুমি যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমার সত্য বিকাশ ও বিকীরণ করিতেছ। বিরাট যাঁহাদের হৃদয়, উদার যাঁহাদের প্রাণ, তাঁহারাই তোমার প্রেরিত সত্য সৎসাহসের সহিত সমগ্র হৃদয়ের সহিত সাদরে বরণ করিয়া লন এবং সমস্ত জীবন ধরিয়া তাহা প্রচার করিয়া যান। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও পরবর্ত্তীগণ তোমারই মুখে সত্যের অমোঘবাণী বর্ত্তমান যুগে শ্রবণ করিয়া আপ্তকাম হইয়াছিলেন এবং যাহাতে আমাদের জীবন ধন্য হয়, তাহার জন্য এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই ব্রাহ্মসমাজে রাজা রামমোহন রায়, উত্তরকালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে মঙ্গলদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, কতশত সাধু-মহাত্মা সেই দীপে ব্যাকুলতার সহিত আপনাদের জীবনপ্রদীপ জ্বালাইয়া ভারতের দূরদূরান্তরে সেই পবিত্র আলোক বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, অনেকে এখনও করিতেছেন। এই মহানগরীর ও নগরোপান্তের নানা স্থানে ও পুণ্য ভারতের নগরে নগরে সত্যের ও বিনাশের জীবন্তবাণীতে তোমারই মধুময় নাম আজ

চারিদিক্ স্পন্দিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে এবং সমস্ত নরনারীর অন্তরকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে, সকলের অন্তরকে আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। ইহার অদম্য প্রভাব সকলকে চিরদিনের জন্য প্রবুদ্ধ করিয়া তুলুক। এই সাময়িক ব্যাকুলতা আমাদের জীবনে নিবিড় হইয়া উঠুক। অদ্যকার উচ্চারিত ব্রহ্মমন্ত্র জীবনপথের চিরসম্বল হউক। অদ্যকার হৃদয়ভেদী সঙ্গীতের ঝঙ্কার প্রাণের বীণাকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলুক এবং আমাদিগকে তোমার পদাবনত ভক্ত ও সেবক করিয়া লউক।

হে ভগবন্! তুমি তোমার সত্যের পতাকা, ধর্ম্মের পতাকা বহন করিবার গুরুভার আমাদের দুর্ব্বল স্কন্ধে স্থাপন করিয়াছ। কৃপা করিয়া বহিবার শক্তি দান কর। বিবেক-বৈরাগ্যকে জীবনের সহচর করিয়া দাও। তুমি যে আমাদের চিরসাথী, চিরনেতা, চিরনির্ভর—এ বোধ আমাদের অন্তরে আরও সুদৃঢ় কর। আমাদের সকলকে ধর্ম্মেতে কর্ম্মেতে প্রেম-ভক্তিতে ও উদারতায় আরও সমুজ্জ্বল কর জগতের উপরে শান্তি ও কল্যাণ বিতরণ কর। বিচ্ছিন্ন ভারতকে একই অখণ্ড ধর্ম্মের সূত্রে গ্রথিত কর। একই বিকাশের পথে, একই সত্যের পথে সমস্ত ধরণীকে আনয়ন কর। সত্যের বিরোধী সম্প্রদায়গত সর্ব্ববিধ বাধাবিঘ্ন অপসারিত কর। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' চিহ্নিত এই পতাকার নিম্নে সকলকে আনয়ন কর। ভ্রাতৃপ্রেমে স্নেহসৌহার্দ্দে সকলকে মিলিত কর। জগৎব্যাপী এক বিশাল অখণ্ড পরিবার গঠন কর। সত্যের পথে, প্রকৃত কল্যাণের পথে, চরম সার্থকতার পথে চলিবার শক্তি দান কর। সকলকে চির উদ্বুদ্ধ কর। অদ্যকার এই উৎসবের বাণী :আমাদের মোহনিদ্রা বিদূরিত করুক, সর্ব্ববিধ জড়তা নির্ব্বাসিত হউক, নবপ্রাণ ও নবজীবন আজ সকলের ভিতরে অবতীর্ণ হউক, যেন এই উৎসব-দিবসে তোমাকে প্রাণ ভরিয়া নিরীক্ষণ করি ও তোমার যশোগানে চির-কৃতকৃতার্থতা লাভ করিয়া নিজ নিজ জীবনকে ধন্য করি।

শতাধিক-দ্বিতীয় মাঘোৎসব।

ভগবানের কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে এবারকার মাঘোৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গেল বলিয়া তাঁহার চরণে সর্ব্বাগ্রে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছি।

উৎসবের প্রারম্ভে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ আশীর্ব্বাদ চাহিয়া পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথকে একখানি পত্র দিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি যে পত্র দিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

কল্যাণীয়েষু

মাঘোৎসবের দৈনিক বিবরণের যে তালিকা পাঠিয়েছ পড়ে খুসি হয়েচি। আশা করি নির্ব্বিঘ্নে কাজ সম্পন্ন হচ্চে। আমি অসুস্থ ইতি ২২ জানুয়ারি ১৯৩২।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের পরমহিতৈষী স্বামী সদানন্দ তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন উৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই। তাঁহার অভাব আমরা প্রতিপদেই অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার আন্তরিক শুভ ইচ্ছা উৎসবসম্পাদনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর তিনি যেভাবে উৎসব-সম্পাদন বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়া আসিতেছিলেন, এবারেও আমরা সেইভাবেই উৎসবসম্পাদনে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম। তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল, ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার পরস্পরের মধ্যে এবং অন্যান্য একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের সহিত ব্রাহ্মসমাজের যথাসম্ভব মিলনসাধন ও মিলিতভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া। ঐ সাধু সংকল্পকে লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া এবারও আমরা উৎসবসম্পাদনে ব্রতী হইয়াছিলাম।

উৎসব যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তাহার উপায়-নির্দ্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল—শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, ডা: শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি-এইচ ডি, বার-এট-ল, শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ, এবং সহযোগী সম্পাদক শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (স্বপদে)। চিন্তামণি বাবু এই সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। সম্পাদক মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহারই বাটীতে এই সমিতির কয়েকবার অধিবেশন হয়। আলোচনা হইয়া যে কার্য্যতালিকা স্থির হইল, তাহা নিম্নোক্ত পত্রের আকারে ১লা মাঘের মধ্যেই কলিকাতা ও উপনগরস্থ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক ও নিয়মিত উপাসকদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল এবং পরে যথাযুক্ত সময়ে সর্ব্বসাধারণ্যে বিতরিত হইয়াছিল।

ওঁ

আদিব্রাহ্মসমাজ।

৫৫, আপার চিৎপুর রোড,—কলিকাতা।

শতাধিক-দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

করুণাময় ভগবানের প্রসাদে ব্রাহ্মসমাজ এক শতাব্দী অতিক্রম করিয়া নব শতাব্দীর দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল। এই দ্বিতীয় বৎসরের মাঘোৎসব পরম্পরের সাহচর্য্যে নিম্নলিখিত তালিকা অনুসারে সম্পন্ন করা হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভক্তজনগণের ও বন্ধুবান্ধবের সমাগমে ও সহৃদয়তার উপরেই উৎসবের সাফল্য নির্ভর করে। সর্ব্বসাধারণের উৎসবে যোগদান সাদরে প্রার্থনীয়।

আদিব্রাহ্মসমাজ
৫৫, আপার চিৎপুর রোড,
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
১লা মাঘ: ১৩৩৮ সাল
১০২ ব্রাহ্মাব্দ।

বিনীত
শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
কর্ম্মাধ্যক্ষ

কার্য্যতালিকা।*

৩রা মাঘ, রবিবার (১৭ই জানুয়ারী)—প্রাতে ৮ ঘটিকায়, নবশতাব্দীর দ্বিতীয় ব্রহ্মোৎসবের উদ্বোধন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর "মিলনের বাণী" বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

৬ইমাঘ, বুধবার (২০শে জানুয়ারী)—সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোভাব উপলক্ষে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হইবে। আচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন এম-এ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিবেন।

৭ই মাঘ, বৃহস্পতিবার (২১শে জানুয়ারী)—সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় আর্য্য-সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ সরল হিন্দীতে ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

৮ই মাঘ, শুক্রবার (২২শে জানুয়ারী)—সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় ব্রাহ্মণসমাজের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ "উপাসনায় ভক্তিবাদ" বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন।

৯ই মাঘ, শনিবার (২৩শে জানুয়ারী)—সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে, প্রমুখ মহাশয়গণ ব্রহ্ম-সংকীর্ত্তন করিবেন।

১০ই মাঘ, রবিবার (২৪শে জানুয়ারী)—সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হইবে। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর আচার্য শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "ভক্তলীলা" বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

পরদিন ১১ই মাঘ, সোমবার (২৫শে জানুয়ারী)—প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকায় বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হইবে। শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস, সি, বি-এল "সংসারে ব্রহ্মসাধন" বিষয়ে বক্তৃতা দিবেন।

উপাসনার কয়দিনই সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে সঙ্গীতের বিশেষ ব্যবস্থা হইবে।

---

* প্রয়োজনমত অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন করা হইলে সংবাদপত্রের সাহায্যে তাহা সর্ব্বসাধারণকে জানান হইবে।

প্রতিদিনের কার্য্যতালিকা তৎপূর্ব্বেই ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিভিন্ন দৈনিক সংবাদ-পত্রের সাহায্যে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। কর্ম্মপ্রণালী স্থিরীকরণে ডাঃ যতীন্দ্রকুমার ও পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

৩রা মাঘ অবধি উৎসব আরম্ভ হইল। ঐ দিবস মাঘ মাসের প্রথম রবিবার এবং মাসিক সমাজের দিন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রতি মাসের প্রথম রবিবার প্রাতঃকালে ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ মাসিক ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাই মাসিক সমাজ উপলক্ষ্য করিয়াই গত ৩রা মাঘ উৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ দিবস শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উৎসবের প্রথম উদ্বোধনরূপে যাহা বলেন, তাহা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। স্বাধ্যায়ান্তে আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত "মিলনের বাণী" বিবৃত হইয়াছিল। ঐ উপদেশে ক্ষিতীন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আদর্শ ও উপদেশ অনুসরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এবং বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মিলনসাধনের উপর বিশেষ জোরের সহিত ঝোঁক দিয়াছেন। এবিষয়ে আমরা সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

৬ই মাঘ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোভাব দিবস। ঐ দিন তদুপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। ঐ দিবস শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদারতা" বিষয়ক একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ইহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। পরদিবস ৭ই মাঘ কলিকাতা আর্য্যসমাজের অন্যতম আচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবৎসরও উপাসনাদি-কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আমাদিগকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল "ভগবদুপাসনা"। ইনি ভবিষ্যতে সময়ে সময়ে আদিব্রাহ্মসমাজে উপাসনা নির্ব্বাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন। ইঁহার সাহায্যে এই প্রকারে হিন্দী ভাষীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল তত্বসকল প্রবেশলাভ করিলে দেশের সুমহান মঙ্গল সাধিত হইবে ভাবিয়া বড়ই আনন্দলাভ করিতেছি।

৮ই মাঘ প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণসমাজের অন্যতম ধর্ম্মবক্তা দার্শনিকপ্রবর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী "উপাসনায় ভক্তিবাদ" বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণসমাজের সহিত প্রগতিশীল ব্রাহ্মসমাজের মিলনের অন্তত একটী পথ যে উন্মুক্ত হইল, ইহাতে আমাদের বড়ই আনন্দ হইতেছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদে এই মিলন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে থাকুক। পরদিন ৯ই মাঘ সায়ংকালে সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে ও তাঁহার সঙ্গী শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত রাধাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দে বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল প্রমুখ মহোদয়গণ দ্বারা ব্রহ্মসংকীর্ত্তন সম্পন্ন হইয়াছিল। উক্ত কীর্ত্তন শুনিয়া সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরদিন ১০ই মাঘ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য সুবক্তা ডাঃ শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষে তিনি মহারাজ জেতের সন্ন্যাসগ্রহণ অবলম্বনে "ভক্তলীলা" বিষয়ক একটী মনোগ্রাহী উপদেশ দিয়াছিলেন। উহাও স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

পরদিন আমাদের প্রিয় ১১ই মাঘ। ঐ দিবস প্রাতঃকালে ৮ ঘটিকায় উৎসব আরম্ভ হইল। ঐ সময় মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনিতে উপাসনামণ্ডপ মুখরিত হইবার পর শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথারীতি বেদী গ্রহণ করিলেন। চিন্তামণি বাবু তাঁহার ভাবোদাত্তস্বরে উপাসকবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করিবার পর যথারীতি স্বাধ্যায়ান্তে সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী কর্ত্তৃক লিখিত "সংসারে ধর্ম্মসাধন" বিষয়ে উপদেশ বিবৃত হইয়াছিল। ঐ উপদেশ এই সংখ্যায় যথাস্থানে প্রকাশিত হইয়াছে।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় এবং সকল ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত মিলনসাধনের জন্য আদিব্রাহ্মসমাজ কিরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নেতৃবর্গের সহায়তা পাইলে আমরা মিলনের পথকে গভীরতর ও প্রশস্ততর করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইব। এবারকার উৎসবে নবনিযুক্ত সুগায়ক সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। অনধিক একমাস কালের মধ্যে তাঁহারা ন্যূনাধিক চল্লিশটী নূতন গান যে ভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্মেলনক্ষেত্র*।

(রায়বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্যাল)

যোগ্যতর ব্যক্তিগণ থাকিতে আমাকেই এই সুধীজন-সভার সভাপতিরূপে মনোনীত করায়, বোধ হইতেছে, আমার বৃদ্ধ বয়সই এক্ষেত্রে গুণ বলিয়া গণ্য। যদি তাহাই হয়, তবে সে গুণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই ভাবিয়াই আমি অবনত মস্তকে অযোগ্যের প্রতি এই সম্মান সবিনয়ে শিরোধার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছি।

এখন, সভাপতির আসন হইতে মুখবন্ধচ্ছলে স্বল্প কথায় আমি এই সভার মুখ খুলিয়া দিতেছি মাত্র। আমার নিবেদন এই যে, আপনারা ইহাকে "অভিভাষণ" না ভাবিয়া সাদর সম্ভাষণ বলিয়াই গ্রহণ করিবেন।

আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে যে কত বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, তাহার সংখ্যা করা দুরূহ। "Comparative Religion" নামক একখানি পুস্তকে দেখিয়াছি, তাহাতে স্থূলভাবে গ্রহণ করিয়াও অন্যূন ৬০ প্রকার বিভিন্ন ধর্ম্মের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। উহাদের মধ্যে প্রত্যেকটীর অন্তর্বিভাগ ধরিতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমতের সংখ্যা যে কি হয়, তাহা গণনা করিয়া প্রকাশ অপেক্ষা অনুমান করাই সহজ। এক ভারতবর্ষেই বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তাহাদের অন্তর্বিভাগ সংক্ষেপে সংগ্রহ করিতে গিয়াও স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়কে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিতে হইয়াছিল।

এই সব বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় যদি শুধু নিজ নিজ মত প্রচার করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহাতে মানবজগতের লাভ বৈ ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাহা না করিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজের মতকে এমন প্রাধান্য দিয়া আসিয়াছেন, যেন সেই মত ভিন্ন অন্য কোন মতের মধ্যে সত্য থাকিতে পারে না। এইরূপ মনোভাব লইয়া পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্ম্মমত প্রচার উপলক্ষ্যে মানুষে মানুষে যে কি বিষম অমানুষিক বাদ-বিসম্বাদ, মারামারি রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে, জগতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে।

ক্রমে শিক্ষার প্রসারবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখন সর্ব্বত্রই ঐ ভাব কমিয়া আসিয়াছে, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। এখন বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষিতগণ পরধর্ম্মের প্রতি পূর্ব্বকার মত খড়্গহস্ত নহেন; এখন তাঁহারা ক্রমেই বুঝিতেছেন যে, ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা মানব-মনের একটা সাধারণ ধর্ম্ম। যেদিন মানব এই পরিদৃশ্যমান্ মহান্ সৃষ্টির দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে শিখিয়াছে, সেই দিন হইতেই ইহার কর্ত্তা কে, কিরূপ এবং কোথায় —এ জিজ্ঞাসা তাহার মনকে আলোড়িত করিয়া আসিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আবেষ্টনের প্রভাবে যে সব ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবৃক্ষ শাখাপ্রশাখায় পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া সেই সেই জাতির আকাঙ্ক্ষা-অনুযায়ী আনন্দরূপ অমৃতফল প্রদান করিয়া আসিতেছে, সৃষ্টির আদি-কারণজিজ্ঞাসাই তাহাদের মূল; এবং সেই আদি কারণের সহিত আমাদের অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টির যে যোগ আছে, সেই যোগের অনুভূতিই সকল ধর্ম্ম-সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই আদি কারণ প্রকৃতপক্ষে মায়াপরিচ্ছিন্ন মানব-মনের পক্ষে অজ্ঞেয় হইলেও, ঐ mysteryই সকল ধর্ম্মের একমাত্র অবলম্বন।

বৈজ্ঞানিক যুগে যখন এ জগতের অনেক mystery ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল, তখন ধর্ম্মপন্থীরা ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি বা ধর্ম্মের mysteryও ভাঙ্গিয়া যায়। এই ভয়েই ইউরোপে কিছুকাল Religion ও science পরস্পর পরস্পরকে ভয়ঙ্কর বিষনয়নে দেখিয়াছিল। এখন উভয় পক্ষেই সে ভ্রম ঘুচিয়াছে—বিজ্ঞান বুঝিয়াছে তাহার যতকিছু গবেষণা ও আবিষ্কার, তাহা এই relative জগতের relative সত্য মাত্র; absolute সত্যের সন্ধান তাহার ক্ষমতার অতীত। কারণ, মানুষ নিজেও relative ও তাহার দৃষ্টি ও চিন্তা সবই relation দ্বারা পরিচ্ছিন্ন।

বিজ্ঞান দেখিতেছে যে জ্ঞানের পরিধি যতই বাড়িতেছে, অজ্ঞানের ধারণা ততই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। বিজ্ঞান দেখিতেছে, যাহা জানা গেল, তাহা অতি সামান্য; যাহা জানিবার উপায় নাই,—অন্ত নাই, মত্র নাই,—তাহাই বিরাট। বিজ্ঞান দেখিয়াছে, সমষ্টির জ্ঞানে Nebulous mass পর্য্যন্ত তাহার সীমা; এবং ব্যষ্টির জ্ঞানে Proton ও Electron তাহার শেষ; এবং জীববস্তুর জ্ঞানেও জীবকোষের পশ্চাতে বৈজ্ঞানিকের যাইবার সাধ্য নাই।

এককথায় জড়বিজ্ঞানের যেখানে শেষ, আধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অর্থাৎ ধর্ম্মতত্ত্বের সেইখানে আরম্ভ। এই

* গত ১২ই মাঘ সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণনগর কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন মহোদয়-প্রমুখ কয়েকজন ভদ্রলোকের উদ্যোগে কৃষ্ণনগরস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এক সম্মিলন-সভায় সভাপতির সংক্ষিপ্ত সম্ভাষণ।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের যাহা জ্ঞেয় বস্তু, তাহা এই দেহ-পরিচ্ছিন্ন মানব-মনের পক্ষে একেবারেই অজ্ঞেয়;—সেই সত্য, নিত্য অবিকারী, অবিনশ্বর সত্তার অস্তিত্ব মাত্র বোধ ছাড়া, যাহাকে প্রকৃতপক্ষে জানা (to know in the sense of knowing) বলিতে পারা যায়, তাহা একেবারেই অসম্ভব। তবু মানবমন সেই অজ্ঞেয়ের জিজ্ঞাসায় অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছায় ক্ষান্ত নহে। জ্ঞানাতীতকে জানিবার উপায় নাই; তবু তাহার জন্য সকল ধর্ম্মের ভিতর হইতে আর্ত্তনাদ উঠিতেছে। ধর্ম্ম-সাধনায় অসংখ্য বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যে অসংখ্য স্তব-স্তুতির মধ্যে ঐ আর্ত্তনাদ খাদের সুরের মত গম্ভীরভাবে ধ্বনিত হইয়া থাকে, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞের কাছে একথা অবিদিত নহে। Max Mullerএর কথায় বলিতে গেলে—"We can hear in all religions a growning of the spirit, a struggle to conceive the inconceivable, to utter the unutterable, a longing after the infinite, a love of God."

সকল ধর্ম্মেরই এই একই অবস্থা; সুতরাং ভ্রাতৃভাবে, বন্ধুভাবে, মানবাত্মার সমান দুঃখে, সেই অজানার সন্ধানে ধাবিত হইবার সমান উৎসাহে আমরা সকলেই সমধর্ম্মী অর্থাৎ সমান অবস্থাপন্ন। অজ্ঞেয়ের সহিত মানবাত্মার যে নিত্য যোগ বর্ত্তমান, তাহারই অনুভূতি সাধনের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অনুসরণ করিয়া, নাম-রূপ-বিবর্জ্জিত সেই আদি কারণকে, সেই Eternal Absolute Inscrutableকে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ দিয়া, আমরা ভুলিয়া যাই যে, সেই একই আমাদের সকলেরই লক্ষ্য। আমরা ভুলিয়া যাই, All roads lead to Rome এই প্রবাদের মত অধ্যাত্ম-রাজ্যেও সকল পন্থাই সেই এক অজ্ঞেয়-মুখী।

সকল পথিকের যথন ঐ একই দশা, তখন ক্ষণেকের জন্য এই পান্থ-নিবাসে একত্রিত আমরা পথের তর্ক-বিতর্কে নিজ নিজ পথের গুণগান এবং পরানুসৃত পথের নিন্দা করিয়া কেন মানবতাকে ক্ষুণ্ণ করি? বরং এই সংসার-দুঃখে সমান কাতর এবং আধ্যাত্ম-দুঃখে সমান আর্ত্ত সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া দুনিয়ার দুঃখ হ্রাস করা, মত অপেক্ষা মানুষকে বড় জ্ঞান করিয়া মানবতার সম্মান করা—সংসার-পান্থ-নিবাসে ইহাই শ্রেয় ও প্রেয়ঃ।

আমি স্বল্প কথায় বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্ভাবিত সম্মিলন-ভূমির দিকে ইঙ্গিতমাত্র করিয়া এই সম্মেলনের উদ্ঘাটন করিতেছি। এখন বক্তা মহোদয়গণ নিজ নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিয়া সভার উদ্দেশ্য সফল করুন।

নানাকথা।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, গত ৯ই মাঘের সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু-পত্রে অগ্রহায়ণ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী হইতে "দেবমন্দিরে প্রবেশনিষেধ" প্রবন্ধটী উদ্ধৃত হইয়াছে। এবিষয়ে যতই অধিক আন্দোলন ও আলোচনা হয় এবং তাহার ফলে ঐ প্রকার অন্যায় ও অসঙ্গত বিধিবিধান যত শীঘ্র বিলুপ্ত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। উক্ত অগ্রহায়ণ-সংখ্যা হইতে গত ১৬ই মাঘের হিন্দু-পত্রে জনৈক শিক্ষক লিখিত "জীবে দয়া" প্রবন্ধটী উদ্ধৃত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে হিন্দুসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক মনে করি। তত্ত্ববোধিনীর ঐ সংখ্যায় স্বামী ক্ষেমানন্দ লিখিত "দেবমন্দিরে অশ্লীলতা" প্রবন্ধটী অনেক দিক হইতে সমর্থন লাভ করিতেছে। গত ২৩শে মাঘ তারিখের সময়-পত্রে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই প্রবন্ধটী উদ্ধৃত হইয়াছে। পুরীধামের মহারাজা বাহাদুরের নিকট লেখকের ইঙ্গিত সমর্থন পাইলেই আমরা সুখী হইব।

মিলনের বাণী :—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, গত পৌষ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত "মিলনের বাণী" সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। বর্ত্তমানে মিলনের যুগ। এই যুগে দেশের মধ্যে মিলনের সুমঙ্গল বায়ু প্রবাহিত করিবার পক্ষে যিনি যতটুকু সহায়তা করিবেন, তিনি ততটুকু ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন নিঃসন্দেহ। "মিলনের বাণী" গত ২৭শে মাঘ তারিখের শিক্ষাসমাচারে উদ্ধৃত করিয়া উহার সম্পাদক মহাশয় তৎসম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

বর্ত্তমান সংখ্যায় যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 'মিলনের বাণী' বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। মিলনবাণীতে জ্ঞানবয়োবৃদ্ধ সমদর্শী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আন্তরিক সরলতা ও উদারতা পরিব্যক্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম-সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে একের অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ, কোন অবস্থাতেই সমর্থন যোগ্য নয়। আমাদের ইহপরকালের যত কিছু অকল্যাণ, বিভিন্ন ধর্ম্ম-সমাজের বিরোধ বা মিলনাভাব হইতেই সঞ্জাত হইয়াছে ও হইতেছে। বহুদর্শী সম্পাদকমহাশয় ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াই বোধ হয় তত্ত্ববোধিনীর মারফতে "মিলনের বাণী" প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা এই অবশ্যপাঠ্য গভীর প্রবন্ধটীর অধিকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। স্থানাভাব

বশতঃ সম্পূর্ণ প্রবন্ধটী প্রকাশ করিতে না পারায় দুঃখ বোধ হইতেছে।"

ঘোড়দৌড়।—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, ১৬ই মাঘের হিন্দুপত্রে ঘোড়দৌড়ের অপকারিতা সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আমরাও এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। বলিতে কি, ঘোড়দৌড়-খেলা ও আইন-সঙ্গত জুয়াখেলা উভয়েই এক বলিয়া জনসাধারণ ধরিয়া লয়। একটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে যে, আলিপুরের জনৈক উকিল বাজীতে হারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। এরূপ আত্মহত্যার দৃষ্টান্ত ঝটিতি মনে আসে না সত্য, কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, বাজীতে অনেক টাকা লোকসান করিবার ফলে বহু পরিবার উৎসন্ন-দশার পথে অগ্রসর হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার মোহমদিরা আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। লেখক একদিন খিদিরপুর হইতে ট্রামগাড়িতে আসিতেছিলেন। একটি হিন্দুস্থানী বালক—অনধিক ১০।১১ বৎসরের—ঘোড়-দৌড়ের মাঠ হইতে সেই গাড়ীতে উঠিল। সে দৈবক্রমে ১ টাকায় ১০ টাকা লাভ করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে সে পাগলের ন্যায় বড়বাজার পর্য্যন্ত সারা পথই লাফাইয়া লাফাইয়া বলিতে লাগিল, 'একরূপেয়া মে দশরূপেয়া মিলা'। বলা বাহুল্য যে, যদি বালকটী লোকসান সহ্য করিত তাহা হইলে সেইরূপ উল্টা-দিকেও উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিত। আমরা জানি, তথাকথিত শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যেও ঘোড়-দৌড়ে যাওয়া ও বাজীখেলা একটা ফ্যাসানের মধ্যে দাঁড়াইতেছে। যাঁহাদের উপর গৃহে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব সংন্যস্ত, সেই মহিলাগণও যদি এ প্রকার জুয়াখেলার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তবে আমাদের বাঁচিবার আশা কোথায়? নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল, এই নীতি অনুসরণ করিয়া আমরাও কলিকাতা কর্পোরে-শনকে বোম্বে কর্পোরেশনের পথ অবলম্বন করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতে অনুরোধ করি, যাহাতে ঘোড়ার মালিক এবং কলিকাতা টার্ফ ক্লাবের মেম্বর ব্যতীত অন্য কাহারও ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলায় যোগ দেওয়া অবৈধ ঘোষণা করিবার ব্যবস্থা হয়।

শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস—আমরা সংবাদ-পত্রে দেখিয়া সুখী হইলাম যে, ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এম-এ মহাশয় আরোগ্যলাভের পথে অগ্রসর হইতেছেন।

মহর্ষির স্মৃতিবার্ষিকী—গত ৬ই মাঘ মহর্ষির স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে কটকে একটী মহতী সভার অধি-বেশন হইয়াছিল। তাহাতে মিঃ টি, আর ফুকন এম-এ ও অধ্যাপক নিরঞ্জন নিয়োগী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বায়োস্কোপ-দর্শনে হতাশ্বাস—গত ২২শে মাঘ তারিখের হিতবাদীতে জনৈক পল্লীবাসী সবাক বায়ো-স্কোপ দেখিতে আসিয়া টিকিট না পাওয়ায় করুণ ক্রন্দন করিয়াছেন দেখিলাম। দেখিয়া দুঃখ, লজ্জা ও আমোদ সকলই উপভোগ করিলাম। দুঃখের কারণ এই যে, এই দুর্দ্দিনে আমরা জানি, অনেক যুবক পিতামাতার মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অর্থে পাঠ্যপুস্তকাদি ক্রয় বা শরীররক্ষার উপযোগী খাদ্য ক্রয় না করিয়া বায়োস্কোপ দেখিতে অম্লানবদনে সেই অর্থ ব্যয় করে। যুবকদিগের এইরূপ উদ্দাম প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। কিন্তু হিতবাদী যাঁহার করুণ ক্রন্দনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তিনি যুবকসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয় না। তিনিও যে এই বৃথা ব্যয়ে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহাতেই আমাদের দুঃখ। তিনি সেই অর্থ গৃহের ও পরিবারের মঙ্গলার্থে ব্যয় করিলে তাঁহার সংসারে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অন্তত এতটুকুও বর্দ্ধিত হইত, তাহা নিঃসংশয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ঠিকই বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কালে বাজে খরচ করিবার একটুকুও অবসর আমাদের নাই। লজ্জার কারণ এই যে, উক্ত পল্লীবাসী তাঁহার হতাশ্বাসের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া করুণ ক্রন্দনে গগন বিদীর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের মনে পড়ে আজ কয়েক বৎসর হইল, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ধুতি-চাদর পরিয়া গ্লোভ থিয়েটারে গিয়া প্রবেশের অধি-কার পান নাই; কারণ ধুতি-চাদর উক্ত থিয়েটার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট অসভ্য বা নগ্নবেশ বলিয়া গৃহীত হইত। তিনি এই কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া উক্ত থিয়েটারের অবিচার ও অত্যাচার মনে করিয়া ক্ষুব্ধ হৃদয়ের ক্রন্দনে দিক্‌বিদিক বিদীর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতের এই চিরদুর্দ্দিনে থিয়েটার-বায়োস্কোপে একটী কপর্দ্দকও ব্যয় করা ভারতবাসীর পক্ষে আমরা পাপ বলিয়া মনে করি। কিন্তু যখন কেহ তথায় প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত হইয়া শিশুর ন্যায় আশাহত হৃদয়ে ক্রন্দন করে, তখন লজ্জায় আমাদের মস্তক নত হয় এবং আমরা ঘৃণার হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের ক্রন্দনে জনসাধারণের হৃদয় নিশ্চয়ই করুণার্দ্র হইয়া উঠে না, কিন্তু আমোদের রসে পূর্ণ হয়।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতশিক্ষা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। ভোটের সাহায্যে নির্ব্বাচন।

আমাদের দাসমনোভাবের কারণে বিজাতীয় আদর্শের অনুকরণে আমরা যে সকল অনিষ্টকর বিষয় এদেশে প্রবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতশিক্ষাকে অবশ্যপাঠ্য হইতে নির্ব্বাসন তাহাদের অন্যতম। আজকাল কি ধর্ম্মসমাজ, কি রাষ্ট্রনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ সকল ক্ষেত্রেই অধিকাংশ স্থলে কর্ত্তৃপক্ষ নির্ব্বাচিত হন ভোটসংগ্রহের সাহায্যে। ভোটবিষয়ক বিদেশীয় অসঙ্গত অনুকরণের ফলে কি হাস্যকর ব্যাপার ঘটিতে পারে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাহার বিশেষ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ইহা বোধ হয় অবিদিত নাই যে, সুপ্রসিদ্ধ ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এক সময়ে একমাত্র ভোটের সাহায্যে ঈশ্বর আছেন কি না, এই প্রশ্নের সমাধান করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন! ইহা জানা কথা যে, এই ভোটসংগ্রহ লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের ও তাঁহাদের নিজ নিজ দলের মধ্যে বিষম বাদবিতণ্ডা বিবাদ-বিসম্বাদ ও হাতাহাতি মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, এই নির্ব্বাচন-ঘটিত বিবাদের পরিণামে বন্ধুগণের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছে। এই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র এই ভোটভিত্তি নির্ব্বাচনের ঠিকই নাম করিয়াছিলেন—স্বর্গ হইতে ধরায় নিক্ষিপ্ত সুবর্ণগোলক।

২। উহার পরিণাম।

ভোটভিত্তি নির্ব্বাচনের এইরূপ পরিণাম দেখিয়া আমরা জানি, অনেক জ্ঞানী, গুণী কিন্তু শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি নির্ব্বাচনের প্রার্থী হইয়া সম্মুখে দাঁড়ান না। যাঁহাদের দেহে বল আছে এবং সময় সুযোগ ও অবসর আছে, তাঁহারাই নির্ব্বাচিত হইবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। যাঁহারা বড় বেশী হাঁকডাক করিতে পারেন, হৈ-চৈ করিতে পারেন এবং ঢাকঢোল পিটাইয়া আত্মপ্রশংসায় গগনভুবন মুখরিত করিতে পারেন, অধিকাংশ স্থলে তাঁহারাই ভোটদাতাদিগের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রদত্ত অধিকসংখ্যক ভোট সংগ্রহ করিয়া নির্ব্বাচনে জয়লাভ করেন। বলা বাহুল্য, এই কারণে অধিকাংশ স্থলেই প্রাচীন ও প্রবীণ জ্ঞানী ও গুণীগণ তরুণদিগের নিকট হইতে ধাক্কা খাইয়া নীরবে বসিয়া থাকেন এবং নবজীবনে প্রদীপ্ত উদ্যমশীল কিন্তু অভিজ্ঞতায় নিতান্তই অর্ব্বাচীন তরুণসম্প্রদায়ই কৃতকার্য্য হন। অনেক স্থলেই এই তরুণসম্প্রদায়ের প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা খুবই কম দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের সন্তোষবিধানের জন্য অনেক প্রবীণ ও প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণও নিজেদের আন্তরিক মতের বিরুদ্ধেও তাঁহাদের মতে সায় দিতে বাধ্য হন।

৩। আমরা সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্যের পক্ষপাতী।

বিশ্ববিদ্যালয়েও ইহার বিশেষ ব্যতিক্রম দেখি না। নানা কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ মতের প্রাবল্যের ফলেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য হইবে কি না, এই প্রশ্ন উঠিতে পারিয়াছে। বলা বাহুল্য, আমরা সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করিবার পক্ষপাতী। গত জ্যৈষ্ঠসংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবীণ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় এ বিষয়ে যে সারগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা তাহা সকলকেই মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

৪। উন্নতির জন্য প্রাচীনের সহিত যোগরক্ষা আবশ্যক।

সুপ্রসিদ্ধ মোক্ষমূলার প্রভৃতি একাধিক দেশীয় ও বিদেশীয় পণ্ডিতপ্রবর সত্যকথাই বলিয়াছেন যে, প্রাচীন ধারার সহিত যোগ অক্ষুণ্ণ না রাখিলে এবং প্রাচীন ধারার ভিত্তির উপরে উন্নতির সোপান সংরচিত না করিলে দেশের উন্নতি ও মঙ্গল সুদূরপরাহত। একথাও ঠিক যে, অন্তত এদেশে সংস্কৃতশিক্ষা প্রকারান্তরে উঠাইয়া দিবার সহায়তা করিলে প্রাচীন ধারার সহিত সেই যোগ কিছুতেই অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারিবে না।

৫। স্বেচ্ছাপাঠ্যের অর্থ নির্ব্বাসন।

যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মনোবৃত্তি কিছুমাত্র অনুশীলন করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন যে, সংস্কৃতশিক্ষাকে স্বেচ্ছাপাঠ্য করিলে শতকরা একজন ছাত্রও তাহার দিকে ঝুঁকিবে কি না বলা যায় না। শুধু সংস্কৃত কেন, যে কোন স্বেচ্ছাপাঠ্য বিষয় সামান্য দুরূহ বোধ হইলেই পরীক্ষার্থীগণ তাহা পরিত্যাগ করিতে উৎসুক হইয়া উঠে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বাবধি ভূগোল শিক্ষাকে স্বেচ্ছাপাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে শুনিয়াছি। তাহার ফলে ছাত্রগণের অনেকে ভূগোল পড়া ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছে। একদিন আমার নিকট প্রবেশিকার একটী ছাত্র সংবাদপত্র পড়িতে পড়িতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল গ্লাসগো কোথায়? Scotlandএর এতবড় সহরের বিষয়ে অজ্ঞতার কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম যে, ভূগোল-শিক্ষা অবশ্যপাঠ্য হইতে নির্ব্বাসিত হওয়ায় সে উহা

ছাড়িয়া দিয়াছে। আমি এই ঘটনাটি পরলোকগত মনীষী সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলাতে তিনি ভূগোলশিক্ষাকে অবশ্যপাঠ্য করিবার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়াছিলেন :এবং এ বিষয়ে চেষ্টা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। জানি না, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ঐ ইচ্ছা সফল করিতে পারিয়াছেন কি না। যখন সহজ ভূগোল :পড়া স্বেচ্ছাপাঠ্য হইবার ফলে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতে বসিয়াছে, তখন ইহা শুনিলে কেহই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না যে, তদপেক্ষা কঠিনতর সংস্কৃত শিক্ষা স্বেচ্ছাপাঠ্য হইলে ছাত্রগণের কেহই উহা স্পর্শও করিবে না।

৬। শিক্ষার দুই দিক—অর্থসাধন ও আত্মোন্নতিসাধন।

এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু আলোচনা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, যাঁহারা সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য করিবার বিরোধী, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই মনোভাব এই যে, বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামের দিনে ছাত্রেরা যতটুকু সময় সংস্কৃত অধ্যয়নে নিয়োগ করিবে, সেই সময়টুকু বিজ্ঞান প্রভৃতি অর্থকরী বিদ্যার আলোচনায় নিয়োগ করিলে দেশের সমধিক মঙ্গল হইবে। বিজ্ঞানকে অবশ্যপাঠ্য করিবার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করিলেও সংস্কৃতকে অবশ্যপাঠ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবার কর্ত্তব্যতা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। শিক্ষার দুইটী দিক আছে—একটী অর্থসাধক, অপরটী আত্মোন্নতিসাধক। দেহ মন আত্মা যেমন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে সংযুক্ত তেমনি শিক্ষারও এই দুইটা দিক অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। পুরাকালে ভারতে এই দুইটা দিকই সামঞ্জস্যের সহিত একই সংস্কৃত ভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। তাহারই ফলে আমরা একদিকে বেদ-উপনিষদ প্রতিপাদ্য জগতের অন্যত্র দুর্ল্লভ অধ্যাত্মতত্ত্বসকল যেমন লাভ করিয়াছি, সেইরূপ অপরদিকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগেও কত অপূর্ব্ব জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত দেখিতে পাই। দুর্ভাগ্যক্রমে নানা ঘটনাবিপর্য্যয়ে সংস্কৃতভাষায় লিখিত বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় অনেক পুস্তক ভারত হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা ভগবানের বড়ই কৃপা যে, সংস্কৃতভাষায় লিখিত অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক পুস্তকাদি ও অধ্যাত্মতত্ত্বসকল ভারতে কেবল স্থায়িত্বলাভ করে নাই, প্রত্যুত বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করিয়াছে। "কেবলমাত্র ব্যবহারিক জ্ঞানের আলোচনাই সংস্কৃত ভাষায় করা হইয়াছে তাহা নহে, সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মবিদ্যা বিশদরূপে সংস্কৃতশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত বোধ হয় কোনও ভাষায় ঐরূপ বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা হয় নাই ... ... ভারতের যাহা কিছু নিজস্ব, তাহা ঐ সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই আছে। অষ্টাদশ মহাপুরাণ, উনবিংশ-সংহিতা, ষড়্‌দর্শন, বেদ, বেদাঙ্গ সকলই সংস্কৃতভাষায় অভিজ্ঞতা থাকিলে সহজে বুঝিতে পারা যায়। এই সকল প্রাচীন শাস্ত্রই একমাত্র ভারতের গৌরব ও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন।"

৭। উচ্চতম অধ্যাত্মতত্ত্বের জন্য সংস্কৃতভাষার সাহায্যগ্রহণ অনিবার্য্য।

যাই হোক, বর্ত্তমান কালে অবস্থানুসারে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, বিজ্ঞানসম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানলাভ করিতে গেলে আমাদিগকে বিদেশীয় ভাষার সাহায্যগ্রহণ করিতেই হইবে। আর ইহাও আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আত্মোন্নতিসাধক উচ্চতম অধ্যাত্মতত্ত্বসকল আয়ত্ত করিতে গেলে সংস্কৃতভাষার সাহায্যগ্রহণ অনিবার্য্য। এইরূপে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান উভয়কে হস্তগত করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইলেই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী—ফলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব উদ্ভিন্ন হইয়া জগতে অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিবে।

৮। বিজ্ঞানের ন্যায় সংস্কৃতও অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত কেন?

ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে, বিজ্ঞান অর্থসাধক হইবার কারণে তাহা যদি প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য অবশ্যপাঠ্যরূপে গ্রহণ করিতে হয়—ছাত্রদিগের বিজ্ঞানের মূলভাব বসাইয়া দিবার জন্য, একটা:ভাল grounding দিবার জন্য যদি উহা অবশ্যপাঠ্য করিতে হয়, তবে আমরাও ঠিক ঐ প্রকার যুক্তি ধরিয়াই বলিব যে, যে ভাষা দ্বারা আত্মোন্নতিসাধনে সহায়ক অধ্যাত্মতত্ত্বসকল উত্তরকালে সহজে আয়ত্ত হইতে পারিবে, যে ভাষার সাহায্যে অতুলনীয় সাহিত্যাদির উপায়ে হৃদয় মন আকাশের ন্যায় বিস্ফারিত হইতে পারিবে, যে ভাষার সহায্যে ভারতের সমুন্নত যুগের ইতিহাস আমরা অধিগত করিয়া আমাদের প্রকৃত উন্নতির পথ দেখিয়া সেই পথে অগ্রসর হইতে পারিব এবং ভারতের অনুপম বৈশিষ্ট্য আমাদের জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে পারিব, সেই ভাষাও প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবশ্য পাঠ করা কর্ত্তব্য। আমরা চাই যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের মধ্যে বিজ্ঞানেরও পত্তনভূমি যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত করা হইবে, সেইরূপ সংস্কৃত ভাষারও সুদৃঢ় পত্তনভূমি বাল্যাবধি গড়িয়া তুলিতে হইবে। অর্থসাধন ও আত্মোন্নতিসাধন, এই